# ভূতেরা ভয়ঙ্কর

গৌরী দে

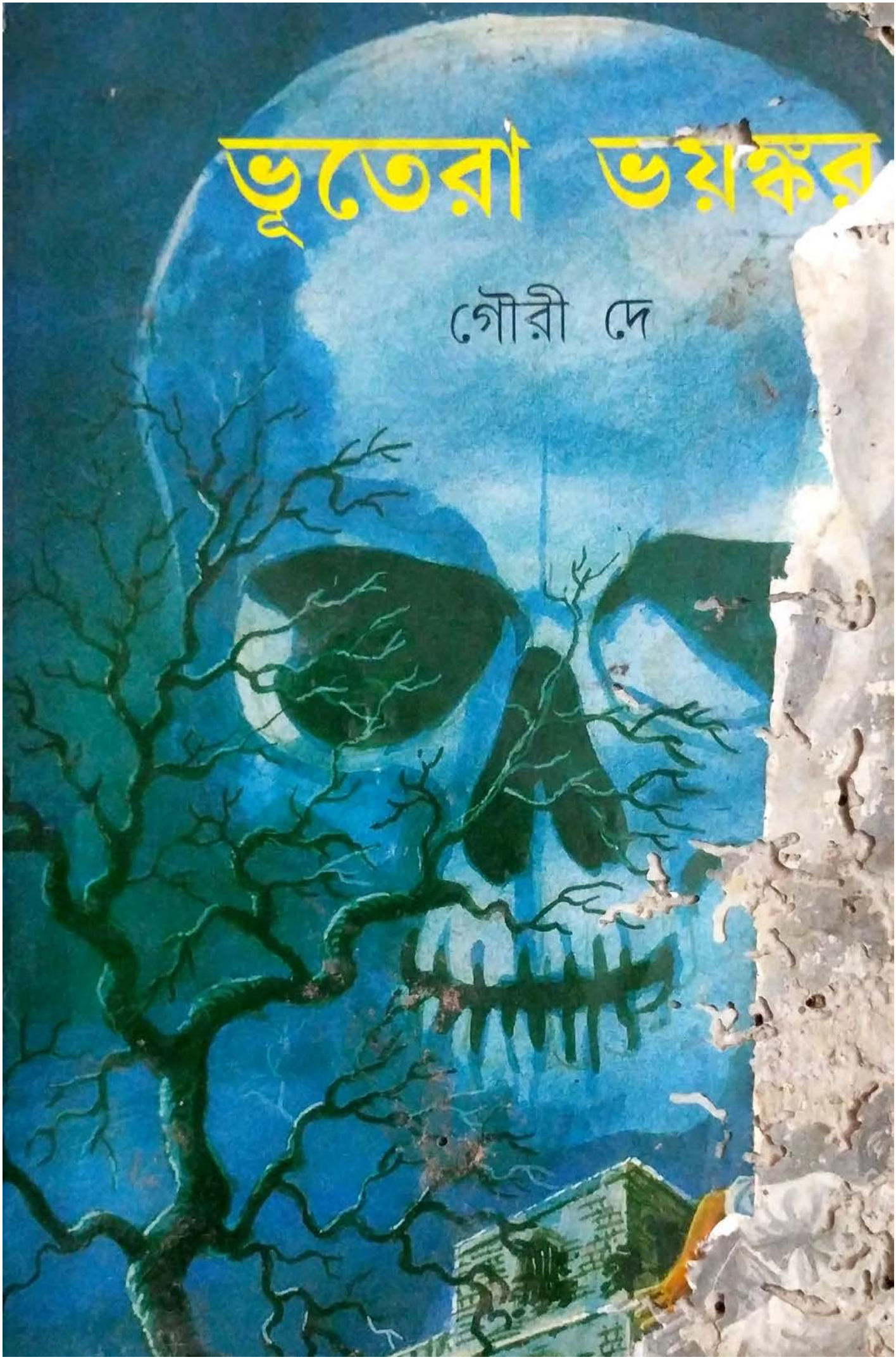

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| ১। | ভালোবাসার টান | ৯ |
| ২। | ভুতুড়ে ক্যাসেট | ১৫ |
| ৩। | কে ডাকে | ২২ |
| ৪। | জোম্বী | ২৮ |
| ৫। | রাতের অন্ধকারে | ৩৫ |
| ৬। | ২৫ বছর পরে | ৪০ |
| ৭। | সেই চেয়ার | ৪৫ |
| ৮। | মাটির নিচে | ৫২ |
| ৯। | ভুড়ু ডল | ৫৭ |
| ১০। | শেষ বিচার | ৬৮ |
| ১১। | রক্তচোষা | ৭২ |
| ১২। | রেফ্রিজারেটর | ৭৮ |
| ১৩। | বইগাছের ডালে | ৮৫ |
| ১৪। | চাকরির বিজ্ঞাপন | ৯০ |

# ভালোবাসার টান

এমনভাবে যে বিপদ আসতে পারে—চার বন্ধুর কেউই ভাবতে পারেনি। মদন বড়লোকের ছেলে, দীঘায় ওদের একটা বাড়িও আছে। প্রত্যেক মাসে বাড়ি দেখাশোনা করার জন্যে কলকাতা থেকে ওদের গাড়ি যায়, ম্যানেজার নন্দদুলালবাবুকে নিয়ে। নবীন, চন্দন আর বিপ্লব ধরে পড়ল মদনকে।

—কদিনের জন্যে আমাদের একটু দীঘাটা ঘুরিয়ে আনতে তো পারিস মদন—

—সত্যি বলতে কি, দীঘার সেই বিধ্বংসী প্লাবনের পর একবারও আর যাওয়া হয়নি। তুই ভার নিলে যাওয়া হয়, বুঝলি?

চন্দন একটু বেশি সাবধানী। বলল—যাবে বলছ যাও—কিন্তু জেনে রেখো দীঘার রাস্তা খুব খারাপ। বিশেষ করে এই বর্ষাকালে। সব ওয়ান পিস্ ফিরলে হয়।

মদন এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। এবার একটি মুচকি হেসে বলল—বেশ তো বাবাকে বলে রাখলেই হবে। এবার আর নন্দজেঠু নয়, আমরা চারজনেই বাড়িটার ওপর খেয়াল রাখব।

কথামতো কাজ হতে দেরি হলো না। ঘোর বর্ষায় ওদের যাবার দিন ঠিক হয়ে গেল। প্রত্যেকের বাড়ি থেকে অল্পবিস্তর আপত্তি এসেছিল, কিন্তু চার যুবকের উদ্যমের কাছে হার মানতে হলো বড়দের। ঠিক হলো ওরা দুপুর ১২টায় খেয়েদেয়ে বেরবে বাড়ি থেকে—যাতে বিকেল ৫টার মধ্যে পৌঁছে গিয়ে রাতের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। মদনের বাবার পুরনো ড্রাইভার কমলবাবুর বয়স হয়েছে। ইদানিং শরীরটাও ভাল যাচ্ছিল না। তবু তিনি জেদ ধরে বসলেন মদনদের একা যেতে দেওয়া হবে না—গাড়ি উনি নিজে চালাবেন। কোলেপিঠে করে মানুষ-করা পুরনো লোক। মদন কমলবাবুর কথা ঠেলতে পারল না। ঠিক হলো সোমবার তারা যাত্রা করবে। অর্থাৎ হাতে তাদের মাত্র দুটো দিন।

কিন্তু সকাল ১১টা বেজে গেল কমলবাবুর পাত্তা নেই। লোক পাঠিয়ে ডেকে আনারও সুবিধে নেই। কারণ মদনরা থাকে সল্টলেকে আর কমলবাবু থাকেন বউবাজারে। সাড়ে ১১টা বাজল তখনও কমলবাবু এলেন না। এরপর দেরি করলে ওদের অসুবিধে। মদন আর দেরি না করে গাড়ির সামনে স্টিয়ারিং ধরে বসল। যাবার সময় দারোয়ানকে বলে গেল—ড্রাইভারবাবু এলে কাল বাসে চলে যেতে বলিস। ফেরার সময় চালিয়ে আসবে।

কার মুখ দেখে যে বেরিয়েছিল ওরা—উলুবেড়িয়া ছাড়াবার পরই ওদের গাড়ি বন্ধ বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। একসময় গাড়িটা পুরো থেমে গেল। বিপ্লব ঘড়ি দেখে বলল—চল সামনে কোনো হোটেল দেখে কিছু খেয়ে নিই। তারপর একটা মিস্ত্রি দেখে গাড়িটা সারিয়ে নেওয়া যাবে এখন।

গাড়িটাকে একপাশে সরিয়ে ওরা পেটভরে জলখাবার খেয়ে নিল একটা রাস্তার হোটেলে। চন্দন বলল—এবার আমরা দরকার হলে ঠেলে দিতেও পারব।

নবীন বলল—ঠেললে যদি চলে, ঠেলতে আপত্তি কি আছে!

কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের। গাড়ি একপাও নড়ল না। ওদের মধ্যে বিপ্লব

একটু ডাকাবুকো। বলল, সামনে একটা লরি আসছে—ওকে হাত দেখিয়ে কিছুটা উপকার আদায় করে নেওয়া যাক।

লড়িটা দাঁড়াল। মদন ওদের সঙ্গে কিসব কথা বলে কিছু টাকা ওদের পকেটে গুঁজে দিল। তারপর বিপ্লবকে বলল—তুই তাহলে যা—সর্দারজী ভালো মিস্ত্রি পাঠিয়ে দিচ্ছে।

সর্দারজী বলল—কাউকে যেতে হবে না। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। মাত্র মাইল দুয়েক দূরেই একটা গ্যারেজ আছে। সাইকেলে আসবে। কত আর সময় নেবে?

দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও সর্দারজী কোনো মিস্ত্রি পাঠাল না। নবীন রাগে গড়গড় করে বলে ওঠে—টাকাটা মেরে দিল রে।

—চল আমরা নিজেরাই দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা। কি যে হয়েছে গাড়িটার...! বলল মদন।

গাড়িটাকে ঠেলে ঠেলে ওরা নিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু ভগবান আজ ওদের ওপর সত্যিই বিরূপ। প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি নামল। ওরা তাড়াতাড়ি গাড়ির ভেতর উঠে বসে জানলার কাচগুলো তুলে দিল। এ কি বৃষ্টি! বন্ধ আর হয় না। একদিকে ঘড়ির কাঁটা ক্রমশ ঘুরে চলেছে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর বৃষ্টি ধরল। বিপ্লব ঘড়ি দেখল। বিকেল চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। নবীন বলল—এ যা ব্যাপার দেখছি—সারারাত রাস্তাতেই কাটাতে হবে।

মদন অত্যন্ত গম্ভীর। চন্দন বলল—সর্দারজী বলছিল মাইল দুয়েক দূরে একটা মোটর গ্যারেজ আছে। গাড়িটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাই চল। এছাড়া আর তো কোনো পথ নেই।

নবীন প্রায় আঁতকে উঠে বলল—দু মাইল রাস্তা এই বিশাল যন্ত্রদানবকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া কি সামান্য ব্যাপার!

মদন এক ধমক দিল, বলল—তাহলে এক কাজ কর তোরা—ফিরন্তি পথে কোনো বাস বা ট্রাক দেখে উঠে পড়।

নবীন বলল—আর তুই? তুই ফিরে যাবি না?

মদন বিরক্ত হয়ে বলল—কি করে বললি কথাটা? কমলদা থাকলেও তাকে আমি একা ফেলে যেতে পারতুম না। আর গাড়িটা ফেলে আমি চলে যাব? তোরা যা।

চন্দন বলল—কেউ যাব না। যা হবার একসঙ্গে হবে। একসঙ্গে এসেছি—একসঙ্গে ফিরব। চল হাত লাগাই।

থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে ঝিরঝির করে। ওরা গ্রাহ্য করছে না। শম্বুক গতিতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। মাঝে দু'একবার চেষ্টা করাও হলো যদি কোনো গাড়ি টেনে নিয়ে যায়—কিন্তু কোনো সাহায্য কোথা থেকেও পাওয়া গেল না।

চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। গাড়ি হেডলাইটের আলোয় প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে এগোচ্ছে। বিপ্লব হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—ঐ দ্যাখ—একটা গ্রাম। দু'চারটে ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে।

নবীন চেঁচিয়ে উঠল—জয় ভগবান। অবশেষে একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে এবার। ভিজে জপজপে চার মূর্তি দেখে দৌড়ে এল কজন ভদ্রলোক। তাদের মধ্যে একজন বেশ লম্বা-চওড়া। বলল—ইস্ কি অবস্থা আপনাদের! আসুন, আমার ঘর আছে—আজ রাতটা সেখানে কাটিয়ে দেবেন। খাওয়া দাওয়া শোয়া—কোনো অসুবিধা নেই।

মদন বলল—সমস্যা আমাদের গাড়িটা...

মদনের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে লোকটা বলল—এসব এখানে আকছার হয়। চিন্তা নেই। আপনি আমায় গাড়ির চাবিটা দিন। আমিও একজন ড্রাইভার। আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি গাড়ি সারিয়ে আনছি। কাল সকালে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা করবেন। যা তো মদন ওদের ঘরে নিয়ে যা।

চার বন্ধু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এমন একটা লোক পাওয়া এ তো ভাগ্যের কথা। ওরা ওদের কাপড়-জামা নামিয়ে নিয়ে মদন নামের লোকটার পেছু পেছু এগিয়ে যেতে লাগল বেশ খানিকটা ভেতরে।

মদন পেছন ফিরে দেখল—লোকটা গাড়ির বোনেট খুলে তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

মদনের তখন কিছু ভাবার মতো অবস্থা নয়। ভাবল—মানুষ মানুষকে তো বিশ্বাস করে। দেখা যাক না কি হয়।

খুব ভাল ব্যবহার করল লোকগুলো মদনের সঙ্গে। একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল—সেখানে চারটে তক্তাপোশ আছে। চার বন্ধু ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে চারটে তক্তাপোশে গা এলিয়ে দিল। সমস্ত শরীর যেন তাদের ভেঙে পড়ছে। একটা কালোকুলো লোক ঘরে ঢুকল। বলল—রাত্তিরে ভাত আর ডিমের কালিয়া ছাড়া কিছু দিতে পারবো না। এটা কি আপনাদের চলবে?

হাতে স্বর্গ পেল চার বন্ধু। এ তো অমৃত। নবীন ভাবাবেগে প্রায়

কেঁদে ফেলল। বলল—পথে না বেরলে বোঝা যায় না কত উপকারী বন্ধু আছে পৃথিবীতে।

ঠিক এই সময় কে যেন খুব মৃদু শব্দে দরজায় আঘাত করল। মদন উঠে বসে কান খাড়া করে শুনল—কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে।

তড়বড় করে উঠে মদন দরজা খুলে দিতেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল—কিন্তু আগন্তুকের মুখ দেখে থেমে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে তার প্রিয়জন কমলবাবু। কিন্তু কমলবাবু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ করতে ইশারা করছেন কেন?

চার বন্ধু দৌড়ে গেল দরজার কাছে। কমলবাবুর অসুস্থ মুখটার দিকে চেয়ে মদন বলল—আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি তোমায় দেখে। তুমি কি করে জানলে আমরা এখানে?

কমলবাবু অল্প হাসলেন। চন্দন বলল—খুব সোজা। বুঝতে পারছিস না কেন? তুই তো আসার সময় দারোয়ানকে বলে এলি, কমলদাকে কাল বাসে চলে যেতে। মেসোমশাই অত বোকা নন বুঝলি। ঠিক খবর নিয়েছেন—আমরা দীঘা পৌঁছেছি কিনা। তারপরের ঘটনা এবার বুঝে নে।

নবীন বলল—না পৌঁছনোর কারণ তো গাড়ি। কয়েক ঘন্টা ধরে আমরা ঘুরছি। যে কোনো দোকানঘাটে জিজ্ঞেস করলেই সন্ধান পাওয়া যায়।

কমলবাবু এতক্ষণ কোনো কথা বলেননি। বললেন—শোনো তোমাদের খুব বিপদ। এখুনি পালাও তোমরা। আমি খবর পেয়েছি এরা ডাকাত। তোমাদের টাকাপয়সা, গাড়ি কেড়ে নিয়ে মেরে ফেলার মতলব করছে। খেতে দেবার নাম করে ওরা একটা জায়গায় নিয়ে যাবে তারপর...। তোমরা পালাও এখুনি।

ভয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল চার বন্ধু। মদন বলল—কি করে পালাব? গাড়ি...।

কমলবাবু বললেন—সব ব্যবস্থা করে এসেছি। গাড়ি তোমার ঠিক হয়ে গেছে। তোমরা নিঃশব্দে পালাও। সামনের দরজা দিয়ে নয়—ঐ জানলায় দেখো একটা রড ভাঙা—ওর ভেতর দিয়ে যাও।

—আর তুমি?

—আমার জন্যে চিন্তা কোরো না—আমি ঠিক বেরিয়ে যাব।

মদন দেখল ঘড়িতে তখন রাত নটা বেজে কুড়ি। বলল—কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না—গাড়িটা...?

কমলবাবু তাড়া দিলেন—সব পরে বুঝবে—এখন পালাও এইবেলা—সুযোগ। ওরা এখন জল্পনাকল্পনা করতে ব্যস্ত—পালাও—মদন পালাও।

চার বন্ধু রাতের অন্ধকারে এক এক করে জানলা গলে লাফিয়ে পড়ল নিচে। বৃষ্টির জন্যে কাদা ভর্তি চারদিকে। লাফানোয় এতটুকু শব্দ হলো না—নিঃশব্দে ওরা গাড়িতে উঠে বসল। কিন্তু কমলবাবু কই—নবীন বলল—কমলদাকে ফেলে যেতে পারি না আমরা। চন্দন বলল—একটু অপেক্ষা করা যাক। এমন সময় কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলল—'পালাও' 'পালাও'। দূর থেকে হৈ হৈ শব্দ কানে এলো। ওরা বোধহয় টের পেয়েছে। ছুটে আসছে দল বেঁধে। মদন নিমেষের মধ্যে গাড়ি স্টার্ট করে বেরিয়ে গেল—কাচের ভেতর দিয়ে দেখল—হাতে লাঠি নিয়ে একদল লোক ছুটে আসছে। উত্তেজনায় মদনের স্পিডের মাত্রা বেড়ে প্রায় ৮০ কি.মি হয়ে গেল। রাত প্রায় দুটো নাগাদ ওরা পৌঁছল দীঘায়। রাস্তায় কেউ একটা কথাও বলেনি এই ক'ঘণ্টায়। সারারাত উত্তেজনায় প্রায় বসে কাটিয়ে, ভোরবেলা মদন ফোন করল বাড়িতে। ফোনটা ধরলেন মহীতোষবাবু—মদনের বাবা। মদন জিজ্ঞেস করল—বাবা—কমলদা পৌঁছেছেন কি?

অবাক হয়ে গেলেন মহীতোষবাবু—কমল? কোথায় পৌঁছবে?

মদন সব ঘটনা বলল খুলে। বলল—কেন তুমি জান না—কমলদা আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছেন?

—না।

—তবে কে পাঠাল ওঁকে?

ওদিক থেকে কোনো সাড়া নেই। মদন ডাকল—বাবা!

মহীতোষবাবু বললেন—তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দিই মদন। গতকাল রাত নটায় কমল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

বিমূঢ় মদনের হাত থেকে ফোনের রিসিভারটা পড়ে গেল।

# ভুতুড়ে ক্যাসেট

স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর অতনুর কাকা একটা ওয়াকম্যান প্রেজেন্ট করেছিলেন অতনুকে। সেই হলো কাল। তারপর থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্যাসেট কেনার নেশা পেয়ে বসল অতনুকে। দু'এক বছরের মধ্যেই অতনু রীতিমতো একটা লাইব্রেরি করে ফেলল ক্যাসেটের। তাতে কি নেই, ইংরিজি, বাংলা, হিন্দি গান ছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের কমিকস্, গীতি আলেখ্য, কবিতা সংকলন ইত্যাদি। এ হেন অতনুর জীবনে একদিন ঘটে গেল এক অভাবনীয় কাণ্ড। কাণ্ডটা এই ক্যাসেট কেনার শখকেই কেন্দ্র করে।

সেদিন ছিল রবিবার। বন্ধুরা ধরল—বইমেলা হচ্ছে দেখতে যাবে। মেলায় গিয়ে অতনুর হঠাৎ চোখে পড়ল লিটল্ ম্যাগাজিনের স্টলের কাছে একটা লোক মাটিতে বসে বিক্রি করছে কিছু ক্যাসেট। বইমেলায়

ক্যাসেট দেখে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে যায় অতনু। বন্ধুরা ঠাট্টা করে—বলে, হয়ে গেল, অতনু ক্যাসেট দেখেছে, আর রক্ষে নেই।

—আহা, কিনি না কিনি, দেখতে কি দোষ? বলল অতনু। তারপর এগিয়ে গেল লোকটির দিকে। বন্ধুরা ওকে সঙ্গ না দিয়ে ইচ্ছেমতো ঘুরতে লাগল। লোকটি অতনুকে দেখে বলে—আপনি যদি ভূত বিশ্বাস করেন তবে এ ক্যাসেট কিনবেন। নয়তো কিনবেন না।

—ভূত? অবাক হলো অতনু। এটা কি ভূতের ক্যাসেট নাকি? লোকটি স্থির চোখে তাকিয়ে রইল অতনুর দিকে। অতনুর মনে হলো—এ দৃষ্টিটা ঠিক মানুষের মতো নয়। পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিল। সে কি ভূতের নাম শুনেই ভয় পাচ্ছে নাকি? অতনু ক্যাসেটটা হাতে নিল। দেখল তার গায়ে লেখা—"পরলোকে"। এ কিরকম ক্যাসেট—অতনু কৌতূহলী হয়ে ওঠে। লোকটি বলে—এতে একটি হারিয়ে যাওয়া মানুষের গল্প আছে। যাকে খুন করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। লোমহর্ষক গল্প। নেবেন?

—কত দাম?—অতনু জিজ্ঞেস করে।

—দশ টাকা।—বলল লোকটি।

মাত্র, দশ টাকা! অতনু ভাবল ক্ষতি কি! ভূতের বইয়ের মতো ভূতের ক্যাসেট থাকলে তার লাইব্রেরির মানই বাড়বে। পাঁচজনকে ডেকে শোনানও যাবে। অন্তত এ ধরনের ক্যাসেট যে থাকতে পারে এটাই হয়তো অনেকে জানে না। অতনু কিনে নিল ক্যাসেটটা। লোকটির দিকে তাকাল। আশ্চর্য! লোকটির চোখ দুটো কেমন যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অতনু তাড়াতাড়ি বন্ধুদের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

বাড়িতে এনে ক্যাসেটটা বাজাতে গিয়েই মাথা গরম হয়ে উঠল অতনুর। যতটা সে শুনল তত পর্যন্ত শুধু একটাই শব্দ—"বাঁচাও বাঁচাও", কে যেন করুণ আর্তস্বরে চিৎকার করছে। প্রচণ্ড রেগে ক্যাসেটটা বন্ধ করে দিল অতনু। লোকটা ভূতের গল্পের নাম করে তাকে ঠকিয়ে দশ টাকা নিয়ে নিল। এ কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না। পরদিনই সে ক্যাসেটটা নিয়ে ছুটল মেলায়। কিন্তু আশ্চর্য! সে লোকটাকে কোথাও দেখতে পেল না। যেখানে সে বসেছিল তার পাশে যারা লিটল ম্যাগাজিন

বিক্রি করছে, অতনু তাদের জিজ্ঞেস করল। কিন্তু অবাক ব্যাপার—তারা জানাল এরকম ধরনের কোনো লোককে তারা দেখেইনি। সারা মাঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল বাড়িতে অতনু। মেজাজ খুব খারাপ, মনে করল একটু গান শুনলে মনটা ঠিক হবে। একটা ক্যাসেট নিয়ে ও ওয়াকম্যানে ভরে শুনতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। এ তো সেই ভূতের ক্যাসেটটাই সে আবার লাগিয়েছে। কিন্তু তার পরিষ্কার মনে আছে সে অন্য ক্যাসেট ফিট করেছিল। কান থেকে ইয়ারফোনটা খুলবে ভাবছে এমন সময় শুনল—গম্ভীর গলায় কেউ বলছে "শুরু হচ্ছে জলাদীঘির কাহিনী"। অতনু কান থেকে ওটা আর সরাতে পারল না—মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগল। বাঁচাও বাঁচাও শব্দটা খুব ক্ষীণ তখন। গল্পটা খুব মামুলি গল্প। প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী নাবালক রণদীপ চৌধুরীর সম্পত্তির লোভে তাকে জলাদীঘির নিচে পুঁতে ফেলেছে তার কাকা ত্রিদিব চৌধুরী। তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছে জলাদীঘির চৌধুরীবাড়ির নায়েব। এমনকি বহুদিনের পুরনো একটা চাকর দেখাশোনা করত রণদীপকে—সেই রমানাথকেও ওরা হত্যা করে পুঁতে রেখে দিয়েছে জলাদীঘির পশ্চিম পাড়ে। তাদের অতৃপ্ত আত্মা কেঁদে বেড়াচ্ছে মুক্তির জন্যে।

অতনু লক্ষ্য করল—ঐ বাঁচাও বাঁচাও আর্তনাদটা শেষ হচ্ছে রণদীপের কাহিনী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু রমানাথের গল্প শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল গোঁ গোঁ করে কাতরানির শব্দ। কি জানি কেন, অতনুর কিন্তু এখন আর ক্যাসেটটার সবটাই গল্পকথা বলে মনে হলো না। বিশেষ করে ক্যাসেট বিক্রেতার ঐ উবে যাওয়ার ব্যাপারটা তাকে ভাবিয়ে তুলল।

তার মনে হলো জলাদীঘির প্রতিটি ঘটনা বোধহয় সত্যি। আর ঐ অতৃপ্ত আত্মারা তাকে উদ্ধার করার জন্যে অনুরোধ করছে। কিন্তু জলাদীঘি জায়গাটা কোথায়, বা আদৌ জলাদীঘি বলে কোনো গ্রাম আছে কিনা সেটাই সে বুঝতে পারছে না। কলেজ থেকে ফেরার পথে প্রায় বাড়ির কাছে এসে অতনু থমকে দাঁড়াল। একটা শীর্ণদেহী লোক ফুটপাতে বসে আছে। তার সামনে কতকগুলো পুরনো ম্যাপের মতো রাখা। কৌতূহলী অতনু লোকটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শীতকাল,

লোকটির গায়ের কম্বল মাথা অব্দি জড়ানো। তবু তার মধ্যে দিয়ে অতনু যেন দেখতে পেল—সেই জ্বলে ওঠা চোখ। অতনু কিসের আকর্ষণে লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। কে যেন তাকে দিয়ে বলাল—জলাদীঘি জায়গাটা কোথায় বলতে পার?

লোকটির চোখ দুটো জ্বলে উঠল। আপনি কি জলাদিঘি যাবেন বাবু—?

—যাব—, তুমি জান গ্রামটা কোথায়? অতনু এসব বলতে চায়নি। কে যেন তাকে এসব বলাচ্ছে।

লোকটি বলল—আমি আপনাকে নিয়ে যাব। কবে যাবেন বলুন।

অতনু মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলল, আগামী শনিবার সকালে। লোকটি উঠে দাঁড়াল। অতনু পরিষ্কার দেখল এই সেই লোক—কিন্তু বলতে পারল না। লোকটি বলল—আগামী শনিবার বেলা দশটায় আমি শিয়ালদার সামনের গেটে থাকব, আপনি আসবেন। বলেই লোকটি খুব তাড়াতাড়ি চলে গেল। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। লোকটি চলে যেতে অতনুর সম্বিত ফিরে এলো। সব ব্যাপারটার মধ্যে একটা কেমন যেন ভুতুড়ে গন্ধ পেল। একবিংশ শতাব্দীর ছেলে সে, ভূত বিশ্বাস সে করে না—কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন গা-ছমছম করে উঠল তার। তবু ঠিক করল ও এর শেষ না দেখে ছাড়বে না। তবে একা নয় ও যাবে রজতকে নিয়ে। রজত ওর প্রিয় বন্ধু—তাছাড়া ওর বাবা একজন নামকরা পুলিশ অফিসার। খুনের ব্যাপারে হয়তো পুলিশের সাহায্য লাগতে পারে। এ ভেবে সেই রাত্রেই সে ফোন করল রজতকে।

শনিবার শিয়ালদা গেটের সামনে এসে রজত আর অতনু তন্ন তন্ন করে খুঁজল লোকটাকে। পেল না। রজত একটু রাগ করে বলে—ব্যাপারটা তোর কল্পনা নয় তো, অতনু! তোর কথা শুনে তখনই বাবাকে দিয়ে পুলিশের কাছে সব রকম হেল্পের জন্যে ফোন করিয়েছি। এখন যদি ফলস্ পজিশনে পড়তে হয়।

চুপ করে গেল রজত। অতনু রজতের কাঁধটা ঝাঁকিয়ে বলল—বিশ্বাস কর সব ব্যাপারটা সত্যি। আমার একটুও বানানো নয়।

রজত হাতঘড়ি দেখল। বলল, এখন সাড়ে দশটা। আর ঠিক দশ মিনিট দেখে...।

রজতের কথা লুফে নিয়ে বলে ওঠে অতনু—আমরা ফিরে যাব, কি বলিস!

রজত ধমক দিয়ে বলে—অ্যাট্ অল জলাদীঘিতে কোনো ঘটনা ঘটেছে কিনা, সেটাই আমার সন্দেহ।

অতনু কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা রোগামতো কালো চেহারার লোক ওদের সামনে এসে দাঁড়াল, বলল—আপনারাই কি জলাদীঘি যাবেন বাবু? চলেন! আমি নিতে এসেছি।

অতনু ভ্রূ কুঁচকে বলল—তুমি কে? তোমাকে আমরা চিনি না।

লোকটি বিনীতভাবে বলল—যার আসার কথা ছিল তিনিই পাঠিয়েছেন।

অতনু বলল—তুমি কি ঐ গ্রামের লোক?

লোকটি উত্তর দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

অতনু অবাক হয়ে বলে—তুমি চিনলে কি করে আমাদের!

লোকটি একটু হাসল। বলল—উনি আমাকে যেমনটি বুঝিয়েছেন, তাতে বোঝার অসুবিধে হয়নি। এখন চলেন বাবু—বেলা হয়েছে।

রজত চুপ করে এতক্ষণ লোকটাকে লক্ষ্য করছিল। বলল—তুমি চেন নাকি তাকে?

লোকটা হাসল, একটুও শব্দ হলো না। বলল—জলাদীঘির গ্রামের প্রজা আমি, নায়েব মশাইকে চিনব না?

কথা না বাড়িয়ে লোকটার সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে অতনু ভাবল—লোকটা নায়েব? অথচ কি রকম যেন—শুকনো চিমড়ে চেহারা—অতনুর তো ভাল করে মুখটাও মনে পড়ল না। শুধু চোখ দুটো জ্বলছিল এটাই মনে আছে।

জলাদীঘির চৌধুরী বাড়ির কাছাকাছি এসে বাড়িটা দেখিয়ে দেবার পর আর লোকটাকে দেখা গেল না। বাড়িটা প্রায় পোড়ো বাড়ির মতো। কিন্তু ঘরের দরজায় পরদা ঝুলছে। অতনুরা সোজা চলে গেল থানায়। রজতের বাবাকে ফোন করে অতনু ফোনটা ধরিয়ে দিল ওখানকার অফিসার করুণা চট্টোপাধ্যায়কে। ভদ্রলোকের নামের সঙ্গে চেহারার কোনো মিল নেই। দেখলেই ভয় করে। করুণাবাবুর বয়স হয়েছে। ফোন রেখে বললেন, চলুন জমিদার বাড়ি যাবার পথে আপনাদের এর ইতিহাসটা শোনা দরকার।

হুবহু এক গল্প। ঠিক যেন ক্যাসেটটাই শুনছে অতনু। সেই এক ঘটনা। বিষয়-সম্পত্তির জন্যে গুম্‌খুন। কাকা তার একমাত্র ভাইপোকে খুন করেছে। কিন্তু কোথায়? কোনো খবর পাওয়া যায়নি, পাওয়া যায়নি রণদীপের ডেড বডি। তার তিন দিন বাদে নায়েব অনন্ত রক্ষিতকেও আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। চমকে উঠল অতনু—নায়েব? তিনি তো...

মাথা নেড়ে অফিসার বললেন—শুধু নায়েব না, রণদীপের খাস চাকরকেও আর পাওয়া গেল না।

রজত প্রশ্ন করে—এদের চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন?

চেহারার বর্ণনা শুনতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল দুই বন্ধু। তাহলে যে অতনুর সঙ্গে কথা বলেছে—সেই নায়েব? আর যে পথ দেখিয়ে আনল—সে তাহলে রণদীপের খাস চাকর!

পরের ঘটনাটাও মিলে গেল ক্যাসেটের সঙ্গে। লোক নামিয়ে জলাদীঘির জল তোলপাড় করে ওরা উদ্ধার করে আনল একটা লাশ। তার আঙুলে চকচক করছে সোনার একটা দামী আংটি। আংটিতে মিনে করা ইংরাজীর R। মনে হলো এটা হয়তো তাহলে রণদীপের কঙ্কাল। কিন্তু নায়েবের আর সেই চাকরটার লাশ তাহলে কোথায়?

ক্যাসেটের গল্পটা মনে করবার চেষ্টা করল অতনু। তারপর পুলিশকে দেখিয়ে দিল দীঘির পশ্চিম পাড়। মাটি খুঁড়ে দুটো লাশ উঠল। কিন্তু জমিদারকে ধরবে কি করে! মনে পড়ল অতনুর, ক্যাসেটে আছে—জমিদার বাড়ির দক্ষিণ দিকের ঘরটা, যেখানে রণদীপ থাকত। তার ঘরের মধ্যে রয়েছে বিরাট মুখওয়ালা পেতলের বড় ফুলদানি। উনিশ বছরের রণদীপ তার ভেতর লুকিয়ে রাখত তার ডায়েরি। পুলিশের সাহায্যে ডায়েরি উদ্ধার করতে ওদের বেগ পেতে হলো না। রণদীপ আর তার চাকর রমানাথ দুজনেই বুঝতে পেরেছিল একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তাই রণদীপ ডায়েরির প্রায় প্রত্যেক পাতায় লিখেছে "আমার যদি কিছু ঘটে তার জন্যে দায়ী থাকবে আমার কাকা। আর আমাকে দিয়ে নায়েব কাকা কি সব সই করাতে চায়। আমি করিনি। রমানাথদা আমাকে বারণ করেছে। ওরা আমাদের দুজনকেই ভয় দেখাচ্ছে।"

ডায়েরির শেষ পাতায় লেখা, "রমানাথদাকে খুঁজে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই কাকা তাকে সরিয়ে ফেলেছে। এবার আমার পালা..."

এরপর সাদা কাগজ। অতনুর কাছে নায়েবের লাশ পাওয়াটা খুব আশ্চর্য মনে হয়েছে। নায়েব তো জমিদারের স্বপক্ষেই ছিল। তবে? অফিসার অতনুর কথা শুনে হাসলেন। বললেন—হাজার হোক বয়সটা তো এখনও কাঁচা তাই সবটা ধরতে পারনি। এটা না বোঝার কি আছে? নায়েব একমাত্র সাক্ষী ছিল ত্রিদিব চৌধুরীর কাজের। তাই কাজ শেষ হবার পর তাকে সরিয়ে দেবার দরকার ছিল।

অতনুর মনে পড়ে গেল নায়েব আর রমানাথকে। গা-টা ছমছম করে উঠল। ত্রিদিব চৌধুরী ধরা পড়ে গেল। সবার কাছে অনেক প্রশংসা নিয়ে ফিরে এল অতনু।

বাড়ি এসে অতনুর সেই ভুতুড়ে ক্যাসেটটা আবার শুনতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু আশ্চর্য ঐ ক্যাসেটটা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

# কে ডাকে

বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলো না মা, প্লিজ। ঠাকুর ভাসান দিতে সব বন্ধুরা তো যাচ্ছে, আমি গেলেই যত দোষ? আমি কি আর ছোট আছি নাকি! কলেজে ঢুকেছি। না গেলে বন্ধুরা ঠাট্টা করবে না!

কদিন ধরে সমানে মাকে বুঝিয়ে চলেছে সুদীপ। তার বাবা ডাঃ অনিমেষ রায় অত্যন্ত রাশভারী মানুষ। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে কথা বলার সাহস সুদীপের নেই। তাই মাকে এত করে বলা। সুনীতা দেবীরও মনের ইচ্ছে নয় সুদীপ যায়। কিন্তু ছেলের আবদার ঠেলতে পারেন না তিনি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলেন, ঠিক আছে যা, তবে তাড়াতাড়ি ফিরবি। মায়ের সম্মতি পেয়ে বাচ্চা ছেলের মতো সুদীপ তাঁকে জড়িয়ে ধরে।

দুর্গাঠাকুর বিসর্জন উপলক্ষে পাড়ায় এবার বিরাট আয়োজন হয়েছে। অন্তত আটটা ব্যান্ডপার্টি এসেছে, আটটা লরি আসারও ব্যবস্থা হয়েছে। সুদীপ সন্ধ্যেবেলা বাড়ি এলো জামাকাপড় বদল করতে। ওর বাড়িটা গলির একটু ভেতরে। বেশ নিস্তব্ধ। দোতলার বারান্দার পাশেই ওর ঘর। ঘরেই ছিল সুদীপ, জামা বদল করছিল এমন সময় শুনতে পেল রাস্তা থেকে ওর প্রিয় বন্ধু চন্দ্র ডাকছে, সুদীপ, এই সুদীপ, কি রে আয়।

জানলার খড়খড়ি তুলে সুদীপ দেখতে গেল, চন্দ্রকে দেখতে পেল না। আন্দাজেই ও চেঁচালো, লরি এসে গেছে বুঝি? ঠিক আছে তুই চল, আমি যাচ্ছি।

দেওয়ালে টাঙানো ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজলো। সুদীপ খুব অবাক হলো, এত তাড়াতাড়ি লরি এসে গেল? ভাল বলতে হবে তো। তাছাড়া চন্দ্রও তো ওর মাসির বাড়ি গিয়েছিল, সকাল সকাল ফিরে এসেছে তাহলে! আসবে না, কতদিন ধরে প্ল্যান হয়েছে আজকের ভাসানে যাবার!

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে সুদীপ মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। সুনীতা দেবী সন্ধ্যা আহ্নিক করবেন বলে তৈরি হয়েছিলেন কিন্তু তখনো বসেননি। জানেন সুদীপ আসবে প্রণাম করতে। বেরুবার আগে মাকে প্রণাম করাটা সুদীপের ছোটবেলার অভ্যাস। সেটা জানেন বলেই ছেলের অপেক্ষায় ছিলেন। সুদীপ মাকে প্রণাম করে ছুটে বেরিয়ে যেতেই দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে সুনীতা দেবী বলেন, দুর্গা, দুর্গা।

অনিমেষবাবু চেম্বার থেকে যখন ফিরলেন তখন রাত দশটা। এসেই প্রশ্ন করলেন, ছেলে কোথায়? সুনীতা দেবী ভয়ে ভয়ে বললেন, ঠাকুর বিসর্জন দিতে গেছে। অনিমেষবাবুর হাতে ব্যাগ, গলায় স্টেথো ঝুলছে, সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে। সুনীতা দেবী ব্যাগটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন, আমি ওকে যেতে বলেছি। রাগ করতে হয় আমার ওপর করো, ওকে কিছু বলো না। ছেলে এখন বড় হয়েছে...

খুব রেগে গেলেন অনিমেষবাবু। বললেন, বড় হয়েছে তো মাথা কিনে নিয়েছে দেখছি। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়েই একেবারে সাপের পাঁচ পা দেখেছে। দাঁড়াও দেখাচ্ছি...

সুনীতা দেবী গলার স্বরটা আরো নামিয়ে বলেন, এবার এসে যাবে, অনেকক্ষণ তো গেছে। তুমি ভেবো না, বড়রাও তো সব সঙ্গে আছেন।

অনিমেষবাবু মুখ ঘুরিয়ে বললেন, বিপদ এলে কেউ কিছু করতে পারবে না।

আঁতকে উঠলেন সুনীতা দেবী, ছিঃ ছিঃ! এসব কি অলক্ষুণে কথা বলছো? ষাট, ষাট, বাছার আমার বিপদ হবে এটা ভাবলে কি করে তুমি?

অনিমেষবাবু আর তর্ক করলেন না, চিন্তিত মুখে ইজিচেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। মনে মনে বললেন, ভাসান দিতে গিয়ে ছেলেরা যে কি করে তা যদি জানতে তুমি!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে মণ্ডপে পৌঁছাল সুদীপ। কিন্তু এ কি! কোথায় লরি, কোথায় ব্যান্ড? খুব রেগে গেল সুদীপ। চন্দ্রর সাত তাড়াতাড়ি ডেকে আনার কি দরকার ছিল? এদিকে সে নিজেই কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে। আসার সময় ভেবেছিল পকেটে করে মার তৈরি গোটাকতক নারকেল নাড়ু এনে বন্ধুদের দেবে, এই চন্দ্রটার জন্যে তাও হলো না। একটু দূরে দেখা গেল এবারের পুজো কমিটির সেক্রেটারি বিশুকে। সুদীপ খুব তড়পে উঠল, চন্দ্রটা কোথায় রে বিশু? সাত তাড়াতাড়ি আমায় ডেকে নিয়ে এলো, ইয়ার্কি পেয়েছে নাকি!

বিশু অবাক হয়ে সুদীপের দিকে তাকিয়ে বলল, কি বকছিস আবোল-তাবোল! কোথায় চন্দ্র? ও তো এখনো ফেরেনি মাসির বাড়ি থেকে। ওর বাড়ির লোকেরা তো তাই ভাবছেন। স্কুটারে গেছে বারাসাতে সেই দুপুরে, এতক্ষণে ফেরা উচিত ছিল।

সুদীপ থমকে গেল। কে ডাকল ওকে? চন্দ্রর গলা তো ভুল হবার নয়। বন্ধুদের মধ্যে ওর গলাটাই একটু মেয়েলী—নরম মোলায়েম। হঠাৎ রক্তে একটা চাঞ্চল্য অনুভব করল সুদীপ, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে তলিয়ে ভাববার মতো সময় পেল না সে। দূর থেকে দেখা গেল প্রসেশন করে আলো, ব্যান্ড, লরি নিয়ে অন্য পাড়ার ছেলেরা চলেছে প্রতিমা বিসর্জনে। চন্দ্রর কথা ভুলে গেল সুদীপ। এখন অনেক কাজ—লরি

সাজানো, প্রতিমা তোলা, বরণ। আবার ভিডিও তোলারও ব্যবস্থা হয়েছে। সুদীপ ছেলেদের ভিড়ে মিশে গেল নিমেষের মধ্যে।

বিরাট প্রসেশন করে ওরা এসে পৌঁছল ঘাটে। প্রতিমা নামানো হলো, তোলা হলো দুটো নৌকোয়। সুদীপ কিন্তু উঠল না, বলল, আমি বরং পাড় থেকে দেখি। মাঝিরা লগি ঠেলে নৌকো নিয়ে চলল মাঝগঙ্গা বরাবর। সুদীপও ভালো করে দেখবে বলে কাদা মাড়িয়ে পাড় ধরে এগোতে লাগল। সামনে পড়ল একটা উল্টানো নৌকো। সেটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতেই সুদীপ দেখতে পেল দূরে দুটো নৌকো ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। ওই তো প্রতিমা পড়ে গেল জলে। সব ভুলে 'জয় মা' বলে সুদীপ লাফিয়ে উঠতেই ঘটল বিপত্তিটা। কাদায় পা হড়কে সুদীপ গিয়ে পড়ল এক কোমর জলে। পাটাও আটকে গেল কাদায়। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল সুদীপ। ধারেকাছে একটাও লোক নেই, চারদিকে ঢাকের শব্দ, হাজার চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। ভয়ে আতঙ্কে সুদীপের গলা শুকিয়ে গেল, মাথা ঘুরতে লাগল, মার কথা মনে হতে চোখে জল এলো। দিশেহারা সুদীপ নৌকোটা আঁকড়ে ধরতে গেল কিন্তু উত্তেজনায় হাত স্লিপ করল। মরিয়া হয়ে ছটফট করে উঠতেই অনুভব করল পা হড়কে সে আরো যেন জলের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে।

দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। একটা দুঃস্বপ্ন দেখে চমকে উঠলেন ডাঃ রায়। চোখ খুলতেই দেখলেন সুনীতা দেবী তখনও দাঁড়িয়ে আছেন জানলায়। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ফেরেনি এখনো? তাহলে তো বেরিয়ে একবার দেখতে হয়।

সুনীতা দেবীর মনে যাই হোক না কেন, প্রকাশ করলেন না মুখে। বললেন, এবার এসে যাবে।

অনিমেষবাবুর তাতে শান্তি হলো না। স্ত্রীকে তিনি বলতে পারলেন না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি পরিষ্কার দেখেছেন সুদীপ গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছে আর চিৎকার করছে 'বাঁচাও বাঁচাও' বলে। কেউ আসছে না তাকে বাঁচাতে।

সুদীপ চিৎকার করে চলেছে প্রাণভয়ে, কেউ শুনতে পাচ্ছে না

তার গলা। চারদিকে এত শব্দ, তার ওপর উল্টোনো নৌকোর ওপাশে আধো অন্ধকারে কি হচ্ছে কেউ দেখতেও পাচ্ছে না। সুদীপের বারবার মনে পড়ছে মায়ের কথা। মায়ের কথা না শোনার ফল ভোগ করছে সে। হঠাৎ বাঁচার এক অদম্য ইচ্ছে তাকে পেয়ে বসল। শরীরে হাজার হাতির বল অনুভব করল সে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে চারপাশটা দেখবার চেষ্টা করল। ওই তো জলে ভাসছে একটা কাঠামো। মাটি গলে গিয়ে খড় আর বাঁশ ছাড়া কিছুই নেই। সেটাই টেনে নিল সুদীপ। যতটা পারল খড় ছাড়িয়ে বাঁশটা বের করে আনল। তারপর সেটা কাদায় গেঁথে পা-টা আস্তে আস্তে টেনে তোলবার চেষ্টা করল। পলকা বাঁশ বারে বারে বেঁকে যাচ্ছে, হাত কাঁপছে উত্তেজনায় তবু সুদীপ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনি করতে করতে হয়তো সে জল থেকে উঠে আসতে পারবে, কিন্তু আর যে সে পারছে না। সমস্ত শরীরের শক্তি তার ফুরিয়ে আসছে একটু একটু করে, দুর্বল হয়ে পড়ল সুদীপ। কেঁদে উঠল চিৎকার করে, মাগো আর বুঝি পারলাম না। আস্তে আস্তে চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে আসছে। এমন সময় শুনল আবার সেই ডাক, সুদীপ...সুদীপ...।

সুদীপ আর ভুল করল না, সাড়া দিল না। মনে মনে বলল, আমি যাব না...যাব না। কিন্তু ভুল করেছিল সুদীপ। এবারের ডাকটা ছিল বিশুর। সুদীপ বুঝতে পারেনি। সুদীপকে দেখতে না পেয়ে ওরা গঙ্গার পাড় দিয়ে ডাকতে ডাকতে এগোচ্ছিল সুদীপের খোঁজে। বিশুই প্রথম দেখতে পেল ওকে। অত্যন্ত করিৎকর্মা ও চালাক বিশু ব্যাপারটা বুঝেই গণেশকে পাঠাল লরি থেকে ঠাকুর বাঁধার দড়িটা নিয়ে আসার জন্য। সবাই মিলে যখন তাকে জল থেকে টেনে তুলল, বাঁচার আনন্দে সুদীপ তখন প্রায় জ্ঞান হারাতে বসেছে। চোখে-মুখে জল দেবার পর সম্বিৎ ফিরে আসতেই ডুকরে কেঁদে উঠল সে। ওরা সবাই ওকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। একসময় শান্ত হলো সুদীপ কিন্তু আর চলতে পারল না। তার দুটো পা অবশ হয়ে গেছে। বন্ধুদের কাঁধে ভর দিয়ে কোনোরকমে ও যখন বাড়ি পৌঁছল তখন রাত একটা। অনিমেষবাবু তৈরি হয়ে বেরুচ্ছিলেন ছেলের খোঁজে।

ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুম হলো না সুদীপের। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে

তার—চন্দ্র তো এখনও মাসির বাড়ি থেকে ফেরেনি। তবে কে তাকে ডাকল?

সুদীপের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল ভোর না হতেই। এক চরম দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে বন্ধুরা। মাসির বাড়ি থেকে ফেরার পথে স্কুটার অ্যাকসিডেন্টে মৃত্যু হয়েছে চন্দ্রর। তার হাতের ঘড়িটা ধাক্কা লেগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সময়টা তখন সন্ধ্যে সাতটা। ঠিক তখনি তো চন্দ্র ডাক দিয়েছিল সুদীপকে। তবে কি সে চেয়েছিল প্রিয় বন্ধু তার সঙ্গী হোক? নাহলে ঠাকুর ভাসান দিতে গিয়ে অমন বিপদে কেউ পড়ে?

# জোম্বী

কলকাতার নামকরা মশলা কোম্পানির মালিক বিজয় গোস্বামীর দুই ছেলে। বড় বিলাস, ছোট জয়। বিলাস যেমন ঠাণ্ডা, বুদ্ধিমান; জয় তেমনি দুরন্ত আর জেদী। বিজয় গোস্বামী ভাবলেন, দায়িত্ব পেলে হয়তো জয় বদলে যাবে। তাই কিছু টাকা দিয়ে তাকে ব্যবসার কাজে আফ্রিকা পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই খবর পেলেন মশলার ব্যবসা না করে কি সব অন্য ব্যবসা করতে গিয়ে লোকসান খাচ্ছে জয়। ধমক দিয়ে জয়কে একটা চিঠি লিখলেন বিজয় গোস্বামী। উত্তরে জয় লিখল, দেশে সে আর ফিরবে না। তবে বাবা যেন তার ভাগের টাকাটা তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেন।

এই চিঠি পাবার পর রেগে গিয়ে বিজয় গোস্বামী তাঁর উইল পুরোপুরি বদলে ফেললেন। সমান দুই ভাগ না করে গোটা সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী করে দিলেন বিলাসকে। বিলাস কিন্তু তার ছোট ভাইকে

খুব ভালবাসে। সে যে এইভাবে বঞ্চিত হবে এটা সে মেনে নিতে পারল না। বাবাকে অনেক বলে বুঝিয়ে একটা ব্যবস্থা করাল। ঠিক হলো যে জয় যদি কোনোদিন ফিরে আসে তাহলে সে এক-চতুর্থাংশের মালিক হবে আর অবিবাহিত অবস্থায় বিলাসের মৃত্যু হলে অর্ধেক বিষয়ের মালিকানা পাবে জয়। বাকি অর্ধেক যাবে বিভিন্ন সেবা সংস্থা ও আশ্রমের হাতে। এই শেষ চালটাতেই মস্ত ভুল করে বসলেন বিজয় গোস্বামী।

ওদিকে আফ্রিকায় গিয়ে জয় সত্যিই কিছু দুষ্টু প্রকৃতির লোকের পাল্লায় পড়েছিল। তারাই তাকে নানারকম মতলব দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাক ম্যাজিকের ব্যবসায় ভিড়িয়ে দেয়। এই সময় হঠাৎ জয় চলমান মৃতদেহ বা জোম্বীর ব্যাপারটা জানতে পারে। জোম্বী কিন্তু মোটেই কোনো মৃত মানুষ নয়, জীবন্ত মানুষই। আফ্রিকার মতলববাজ পুরোহিতরা কোনো একজন মানুষের দেহের কোনো ক্ষতস্থানে কিছু বিষাক্ত ওষুধপত্র ঘষে ঘষে তাকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলে যে তার দেহে মৃতের লক্ষণ ফুটে ওঠে। তখন ডাক্তাররাও তাকে দেখলে বুঝতে পারবে না যে সে বেঁচে আছে। এই মৃতকল্প মানুষটিকে কবরও দেওয়া হয়। তারপর মাঝরাতে পুরোহিতরা গিয়ে তাকে কবর থেকে বার করে মাথায় সামান্য আঘাত করে আর তাতেই জ্ঞান ফিরে আসে তার। তখন সে পুরোপুরি জোম্বী। জ্ঞান আছে কিন্তু চিন্তা, ইচ্ছে, বিবেকবোধ কিছুই নেই। তখন মনিব তাকে যে আদেশই দিক না কেন, সে আদেশ পালন করবেই অক্ষরে অক্ষরে, তারপর ঘুমিয়ে পড়বে আবার। এই অবস্থায় সে মনিবের ক্রীতদাস হয়ে থাকবে যতক্ষণ না তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।

ব্যাপারটা জেনে যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল জয়ের। দুষ্টু বন্ধুদের উস্কানি তো আছেই, কিন্তু মোটা টাকার লোভ দেখানো সত্ত্বেও পুরোহিতরা বিষাক্ত ওষুধের রহস্য জানাতে রাজী হলো না কিছুতেই। খানিকটা ওষুধ দিতে রাজী হলো শুধু। লাখ খানেক টাকা দিয়ে তাই কিনল জয়। তারপর ফিরে এল দেশে। বিজয় গোস্বামী মারা গেছেন তার আগেই।

দাদা বিলাস ভাইকে পেয়ে আনন্দে অস্থির। গ্রীষ্মকালের এই সময়টা বিলাস তাদের শুকচরের বাড়িতেই দিন কাটায়। পাশেই বয়ে যাচ্ছে গঙ্গা। আলো-হাওয়ার অভাব নেই বাড়িতে। তবু তিনতলাটাই সেরা।

বিলাস জয়কে তিনতলা ছেড়ে দিয়ে নেমে গেল দোতলায়। আহা, এতদিন পরে ফিরেছে! একটু আরাম করুক।

তিনতলার বাড়ির বারান্দায় বসে গঙ্গার দিকে তাকিয়েছিল জয়। দাদার আদর-যত্নে ওর মনটা নরম হয়ে আসছিল, মায়া পড়ছিল দাদার ওপর, কিন্তু গতকাল বন্ধুদের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়ে মাথাটা আবার গরম হয়ে উঠেছে। এখন সে ভাবছে বাবার বিপুল সম্পত্তিটা কেমন করে দখল করা যায়। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ জোম্বীর কথা মনে পড়ে গেল। তাই তো! আফ্রিকা থেকে আনা ওই ওষুধের যদি সত্যি কোনো ক্ষমতা থাকে, যদি সত্যি একটা জোম্বী তৈরি করতে পারে সে, তাহলে তো সে যা খুশি তাই করতে পারে।

কিন্তু থমকে গেল জয়। জোম্বী করার মতো মানুষ সে কোথায় পাবে? এই সময় হঠাৎ তার চোখ পড়ল বাড়ির লাগোয়া ঘাটে। ঘাটের ধারে এক কোণে বসে আছে এক মাঝবয়সী ভিখিরী। পরনে ময়লা চিরকুট একখানা কানি, অনাহারে মুখ শুকনো। জয়ের মনে হলো এর চেয়ে ভালো জোম্বী বোধহয় আর পাবে না।

রাত সাতটা নাগাদ লোকটা উঠে দাঁড়াল। জয় কোনোরকমে বাইরের পোশাক পরে নিচে নেমে চাকরকে বলল, দাদাকে বলিস আজ আমার একটা পার্টি আছে, খাওয়া-দাওয়া করে ফিরতে রাত হবে। দাদা যেন শুয়ে পড়ে। তোরাও শুয়ে পড়িস। আমি সদরের চাবি নিয়ে নিয়েছি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে লোকটার কাছে এগিয়ে গেল। লোকটা একটা খাবারের দোকানের সামনে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াল। জয় খাবার কেনার ছুতো করে ভিখিরীটার সামনে দাঁড়াল। ওকে দেখিয়ে এতগুলো টাকা বার করল। ভিখিরীটা বলল, সারাদিন কিছু খাইনি বাবু। কিছু দেবেন?

এই সুযোগই খুঁজছিল জয়, বলল, চল তোমাকে একটা হোটেলে নিয়ে যাই।

লোকটা ভয় পেল। বলল, না বাবু, হোটেলে কাজ নেই, দুটো টাকা পেলেই হবে।

জয় হাসল, বলল, ভয় পাচ্ছ? আচ্ছা ঠিক আছে, আজ যখন কথা দিয়েছি তখন আমার কাছে তোমায় খেতেই হবে, চল খাবার কিনে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে বসে খাই। আজ রাতে তুমি আমার অতিথি...

লোকটা অবাক হয়ে তাকাল জয়ের দিকে। বলল, বাবু, আপনি দেবতা!

বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাবারের সঙ্গে কড়া ডোজে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে জয় ভিখিরীটিকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। কব্জির কাছে বেশ খানিকটা জায়গা কেটেও দিল ছোট্ট ছুরিটা দিয়ে। তারপর খাটের নিচে রাখা বড় অ্যাটাচি খুলে ভেতর থেকে বার করল সেই বিষাক্ত ওষুধ।

রাত তখন একটা। বাকি রাতটা কেটে গেল জোম্বী তৈরির মেহনতে। ভোরের দিকে ভিখিরীটার চোখের মণি বড় হলো, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস এত ধীর হয়ে এল যে মনে হলো না ও বেঁচে আছে। জয় সেদিকে তাকিয়ে বলল, আজ এরকম থাকো, কাল তোমাকে জাগাব। তার ঘরের পাশেই আছে একটা ছোট্ট স্টোররুমে, সেই ঘরে জোম্বীকে ঢুকিয়ে রেখে জয় ঘর পরিষ্কার করে ফেলল। সুগন্ধি ছড়িয়ে বিষাক্ত ওষুধের দুর্গন্ধটাও তাড়াল। তারপর স্টোররুমে মজবুত গোছের একটা তালা লাগিয়ে দিল।

সারাদিন অফিস সেরে ক্লান্ত বিলাস ফিরল প্রায় রাত আটটায়। এর কিছুক্ষণ পরেই জয় এল বিলাসের ঘরে। ওকে দেখে বিলাস খুব খুশি হয়ে বলল, আয়, আয়, বোস, কিছু বলবি?

জয় বলল, তেমন কিছু নয়, ভাবছিলুম তোমার সঙ্গে একটু বসব। তোমার একার ওপর তো বড্ড চাপ পড়ছে দেখছি। আমি যদি...

উচ্ছ্বসিত হয়ে বিলাস বলল, বেশ তো, আয়, বোস।

জয় বলল, এখন না, খেয়ে এসে। একটু রাত করে হলে ভাল হয়। চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, তখন জটিল জটিল সব ব্যাপারগুলো চট করে ঢুকে যাবে মাথায়। তুমি দরজা খুলে রেখো, আমি আসব।

বিলাস একটু হেসে ওর পিঠে হাত রেখে বলল, ঠিক আছে। তাই হবে। বেশি দেরি করিসনি কিন্তু। বড্ড ক্লান্ত লাগছে আজ।

খাওয়া-দাওয়া মিটতেই দেওয়াল-ঘড়িতে রাত দশটার বাজনা শুরু হলো। খাবার ঘর একতলায়, সুতরাং কাজের লোকদের দোতলা-তিনতলায় ওঠার প্রশ্ন নেই। জয় সোজা তিনতলায় উঠে ঘরের দরজাটা লক করে দিল। উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। একবার ভাবল, থাক, দরকার নেই বিষয়ে। দাদা তো কোনো অভাবই রাখেনি! পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল বন্ধুদের কথা—পৃথিবীর রাজা হব আমরা। জয় পাশের

ঘরে গেল, জোম্বীকে একটু ঠেলে দেখল। এ কি! জোম্বীর তো চোখ মেলে তাকাবার কথা নয়! তবে কি ওষুধটার গুণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? জয় দৌড়ে গিয়ে বাকি সেই বিষাক্ত ওষুধ নিয়ে এসে পাগলের মতো জোরে জোরে ঘষতে লাগল ক্ষতস্থানে। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, জয়ের খেয়াল নেই। বেশ খানিকক্ষণ পরে জয় দেখল প্রায় সব ওষুধটাই লাগানো হয়ে গেছে। জোরে জোরে ঠেলা মারল জোম্বীকে। নাঃ, জোম্বী তাকাল না। যাক্, নিশ্চিন্ত। এবারে জোম্বীকে জাগাবার শেষ কাজটা করল—আস্তে করে তার মাথায় দু-তিনবার টোকা মারল। জোম্বী চোখ খুলল। সে চোখে পাথরের দৃষ্টি। ভয়ে শুকিয়ে এল গলা, কোনোরকমে জোর করে বলল, উঠে দাঁড়াও।

জোম্বী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

জয়ের চোখের ওপর ভেসে উঠল একটা খবর। কালকের কাগজের প্রথম পাতায় থাকবে, বিখ্যাত মশলা ব্যবসায়ী বিলাস গোস্বামীর ঘরের জানলা দিয়ে চোর ঢুকে, তাকে খুন করে সব টাকাপয়সা লুট করে নিয়েছে। তার পরের অংশটা জয় আর একবার ভেবে নিল। খুন হয়ে যাবার পর ও হাতে গ্লাভস্ পরে ঘরের জানলা খুলে দেবে। জামাকাপড় হাঁটকে আলমারিটা খুলে রাখবে হাট করে। কাজটা মোটেই শক্ত নয়, কারণ বিলাসের চাবির গোছা থাকে ব্রিফকেসে আর ব্রিফকেসটাকে বিলাস মাথার কাছেই নিয়ে শোয়। নিজের শরীরে দু-এক জায়গায় কাটাছেঁড়ার চিহ্নও করে রাখবে। তারপর চিৎকার করে লোক জড়ো করবে। ততক্ষণে জোম্বী ফের ঘুমিয়ে পড়বে। সকলে জানবে শব্দ শুনে দাদাকে বাঁচাতে এসে চোরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিল জয়, সেই সময় চোরটা হার্টফেল করে। সেটাও অসম্ভব নয়। কারণ ভিখিরীটাকে সবাই চেনে। না খেয়ে খেয়ে সে তো প্রায় মারাই যাচ্ছিল, হঠাৎ লোভ সামলাতে না পেরে চুরি করতে গেছে। ঘুমন্ত বিলাসকে গলা টিপে মেরেছে। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেনি।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় জোম্বীর কথা ভুলেই গেছিল জয়। হঠাৎ দেখল জোম্বী তার দিকে বীভৎস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটো টক্‌টক্ করছে। ভয় কাটিয়ে তখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি জয়—তাড়াতাড়িতে বলে উঠল, কোঁকড়া চুল, ফরসা, এক যুবক—যাও মেরে এসো।

জোম্বী এক পা এক পা করে এগিয়ে এলো তার দিকে। তার চোখ জয়ের কোঁকড়া চুলের দিকে। জয় নিজের ভুল বুঝতে পারল, বলল, নেমে যাও দোতলায়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রথম ঘর। উত্তেজনায় জয় একটা ভুল করে ফেলল। জোম্বীদের গায়ে হাত দেওয়া মানা। জয় কিন্তু জোম্বীকে পেছন থেকে ঠেলে সিঁড়ি অবধি নিয়ে এলো। জোম্বী নামতে লাগল অতি ধীরে—এগিয়ে চলল বিলাসের ঘরের দিকে।

জয় নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। যদি চেঁচামেচি ধস্তাধস্তিও হয় লোক দেখবে জয় ঘুমোচ্ছে। শুধু ঘরের দরজাটা লক করল না, ভেজিয়ে রাখল। কেননা একটু পরেই তো সে নিচে নামবে। এক একটা মুহূর্ত যেন এক এক ঘণ্টা। দেওয়াল-ঘড়িতে টুংটাং করে ঘণ্টা বাজতে লাগল। রাত বারোটা। জয়ের সমস্ত শরীরে যেন রক্তচলাচল বন্ধ হয়ে এলো। এ কি করল সে, জোম্বীকে পাঠাবার আগে ঘড়িটা দেখে নিল না! বিলাসের ঘরের দরজা বন্ধ হলে কি করবে জোম্বী! মনে পড়ল পুরোহিতের কথা, সাবধান। ওরা কিন্তু আদেশ পালন করবেই, যেভাবেই হোক।

জয়ের ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। অন্ধকার ঘরের দরজায় একটা বিরাট ছায়া পড়ল। সিঁড়ির আলোতেই বুঝতে পারল জয় জোম্বী ফিরে এসেছে। ভয়ে জয় ঘরের আলো জ্বেলে দিল। উঃ! কী ভীষণ! জোম্বীর চোখের দৃষ্টি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। একটু একটু করে সে এগিয়ে আসছে ফরসা, কোঁকড়াচুল জয়ের দিকে। জয় নিস্পন্দ, নিথর, পালিয়ে যাবার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে। কে যেন তার পায়ে ভারী পাথর বেঁধে দিয়েছে। জোম্বী এসে দাঁড়াল জয়ের সামনে, কাঠের মতো হাত দুটো সোজা হলো, আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতো হয়ে এগিয়ে এলো জয়ের গলা লক্ষ্য করে। নিমেষে সম্বিত ফিরে পেল জয়। টেবিলের ওপর রাখা পেতলের বড় ফুলদানি দিয়ে সজোরে আঘাত করল জোম্বীর মাথায়। লুটিয়ে পড়ল জোম্বী। আর এক মুহূর্ত দেরি না করে জয় জোম্বীর দেহটা টেনে নিয়ে এলো বারান্দায়। নিচেই গঙ্গা। ঝপ্ করে শুধু একটা শব্দ হলো। জোম্বীর দেহটা ডুবে গেল গঙ্গার অতলে।

ক্লান্ত, বিষণ্ণ, বিধ্বস্ত জয় শরীরটাকে কোনোরকমে টেনে বিছানায় ফেলে দিল। তার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হলো। টাকা গেল, সময় গেল,

ভবিষ্যতের সব আশা নির্মূল হয়ে গেল। জয় আর ভাবতে পারল না।

ভোর রাতে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল জয়, হঠাৎ হাতে একটা ঠাণ্ডামতো কি যেন ঠেকতে চমকে উঠল। প্রচণ্ড ভয়ে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। তার পাশে শুয়ে আছে জোম্বী। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? সে তো নিজে হাতে...। তবে কি এ জোম্বীর প্রেতাত্মা?

উত্তর পাওয়া গেল দুদিন বাদে, একসঙ্গে দুটো লাশ ভেসে উঠল জলে।*

* জোরা হার্সটনের 'জোম্বী' আর্টিকেল থেকে তথ্য সংগ্রহ।

# রাতের অন্ধকারে

গভীর রাত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে চমকে উঠল অনীশ। একটা কর্কশ তীক্ষ্ণস্বরে কে যেন বলছে—"কৌন আয়া হ্যায়?" প্রথমটা অনীশের মনে হলো বুঝি স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু নাঃ, ঐ তো আবার সেই ডাক। "কৌন আয়া হ্যায়?" "কৌন আয়া হ্যায়?"

একটানা বলে চলা স্বরে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল বিছানা থেকে অনীশ। পাশের ঘরে মা ঘুমচ্ছেন। অসুস্থ। হয়তো বা জেগেও উঠেছেন। খাট থেকে নেমে পাশের ঘরের অল্প ফাঁক করা দরজা দিয়ে অনীশ দেখল মা জেগে উঠেছেন কিনা। নাঃ ঘুমচ্ছেন। কিন্তু এমন কর্কশ কণ্ঠে কে ডাকছে? কোথা থেকে শব্দটাই বা আসছে! রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে উঠল অনীশ। অনীশ নিজের ঘরে এসে বালিশের তলা থেকে টর্চটা বার করল। হাতে একটা অস্ত্র হলে ভাল হতো। এদিক-ওদিক তাকাতেই অনীশ দেখল একটা বাঁশের লাঠি রয়েছে ঘরের কোণে।

অনীশ নিশ্চিন্ত হয়ে টর্চ আর লাঠি হাতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আচ্ছা কেউ বদ মতলবে এমন চেঁচাচ্ছে না তো? বলা যায় না ডাকাতির মতলবও তো হতে পারে। হয়তো এইভাবে ডেকে দেখে নিচ্ছে সবাই ঘুমিয়েছে কিনা। অনীশ আবার ভাবল, এমনও তো হতে পারে কেউ এভাবে ডেকে তাকে সাবধান করে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে অনীশ থেমে গেল। গাটা কেমন যেন ছমছম করে উঠল। সবেমাত্র গতকাল সে তার মাকে নিয়ে এসেছে এখানে। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, "মাকে নিয়ে পশ্চিমে যাও।" অনীশ সন্ধানে ছিল—পেয়ে গেল শিমুলতলার এই বাড়িটা। সবেমাত্র গতকাল সে এসেছে এখানে। বাড়িটা পুরনো আমলের। ঘরগুলোও কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার। কিন্তু কি করবে? মায়ের শরীরের জন্যে চেঞ্জে যাওয়ার দরকার ছিল। তাই ডাক্তারকাকার পরামর্শে দশ-বারো দিনের জন্যে তাকে আসতে হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি আর কোনো বাড়িও কোথাও পাওয়া গেল না। আবার সেই চিৎকার। অনীশ এবার বেপরোয়া হয়ে উঠল। যা হয় হবে—তাকে দেখতেই হবে কি ঘটছে ব্যাপারটা।

কিন্তু কি আশ্চর্য! সারা বাড়ি টর্চের আলোয় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো কিছু হদিস পাওয়া গেল না। অনীশের মনে হলো—শব্দটা বোধহয় তাহলে বহুদূর থেকে আসছে। কারণ গ্রামগঞ্জে অনেক সময় দূরের শব্দ মনে হয় যেন খুব কাছে হচ্ছে। হতে পারে অনেক দূরে কোনো রাতের পাহারাদার হাঁক দিয়ে চলেছে। তার ঐ ডাকটাই অনীশকে বিভ্রান্ত করেছে। নিজের ভয় দেখে অনীশের নিজেরই হাসি পেল। দালান পেরিয়ে অনীশের ঘর। অনীশ ঘরে ঢুকতে যাবে—এমন সময় হঠাৎ আবার সেই চিৎকার, এবার একেবারে কানের কাছে। অনীশ এত জোরে চমকে উঠল যে তার হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চ আর লাঠি দুটোই পড়ে গেল শব্দ করে। অনীশ সেই দোদুল্যমান টর্চের আলোয় দেখল দালানের এক কোণে প্রায় অন্ধকারে একটা খাঁচায় একটা পাখি। পাখির চোখ দুটো টর্চের আলোয় জ্বলে উঠতে লাগল। পাখিটা মাথাটা একটু কাত করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। মুহূর্তের মধ্যে পাখিটা ডেকে উঠল—"কৌন আয়া হ্যায়?" এবার সত্যি সত্যি শব্দ করে হেসে উঠল অনীশ। একটা পাখি, কে হয়তো তাকে কথা বলতে শিখিয়েছে—তা ভাল। কিন্তু তাই বলে, এই মাঝরাত্তিরে এরকম চেঁচাতে

হবে? চেঁচাবার আর সময় পেল না। নিশ্চিন্ত হলেও একটু বিরক্ত হয়ে অনীশ একবার মায়ের ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে নেয় মা ঘুমোচ্ছেন কিনা। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরে শুতে চলে গেল। ঠিক করল পরদিন সকালে মালীকে বলে পাখিটাকে অন্য কোথাও সরাবার ব্যবস্থা করবে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! পরদিন সকালে কিন্তু আর সে পাখিটাকে দেখতে পেল না। মালীকে ডেকে পাখিটার কথা জিজ্ঞেস করতে সে তো আকাশ থেকে পড়ল। বলল—সে কী বাবু, পাখি কোথা থেকে আসবে? আপনি ঠিক দেখেছেন তো বাবু?

মালী উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেল। অনীশ বুঝতে পারল মালী তার কথা বিশ্বাস করল না। সত্যি বলতে কি সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কি হলো!

ঠিক রাত দুটো নাগাদ পাখির চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল অনীশের। অনীশ মাথা ঘামাবে না ঠিক করল—কানের ওপর বালিশ চাপা দিয়ে শুয়ে রইল। সারারাত চিৎকার করে ভোরের দিকে পাখিটা চুপ করল। অনীশ ঠিক করল এর একটা বিহিত তাকে করতেই হবে। মালীকে বলে হবে না। যা করবার সেই করবে। কিন্তু আশ্চর্য লাগছে তারও। পাখিটা রোজ রাতে খাঁচার ভেতর থেকে চেঁচায় আর ভোর হলেই অদৃশ্য হয়ে যায়। যায় কোথায়? আসেই বা কোথা থেকে? তবে কি এসবের পেছনে মালীর কোন দুরভিসন্ধি কাজ করছে! অনীশ ঠিক করল আজ রাত্তিরে পাখিটা চেঁচালে সে খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে আসবে। হয়তো খাঁচায় বন্ধ থাকে বলেই পাখিটা চেঁচায়। ছাড়া পেলে উড়ে যাবে।

গভীর রাতে পাখিটা আবার চিৎকার করে উঠল। অনীশ তৈরি ছিল, পা টিপে টিপে টর্চ নিভিয়ে দালানে এলো। ঝপ্ করে আলো জ্বালতেই অনীশ দেখল—ঠিক সেদিনের মতো পাখিটা বসে আছে খাঁচায় ওর দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাত করে। কাছে যেতে মনে হলো পাখিটা বোধহয় 'টিয়া'। সাহস সঞ্চয় করে অনীশ ধীরে ধীরে খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। কিন্তু পাখিটা উড়ল না, বসে রইল যেমন ছিল। অনীশ মনে করল, রাত্তির তাই—, সকাল হলেই ঠিক উড়ে পালাবে। সে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমতে পারল না।

ভোর রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে ও দালানের দিকে এগিয়ে চলল। তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। সেই প্রায় অন্ধকারে টর্চ হাতে নিয়ে অনীশ এগিয়ে গেল খাঁচার দিকে। আলো পড়তেই অনীশ চিৎকার করে উঠল আতঙ্কে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। পাখিটা দাঁড়ে নেই—পড়ে আছে খাঁচার নিচে টুকরো টুকরো হয়ে। একটা বুনো বেড়াল বসে আছে দালানের এক কোণে ঘাপটি মেরে। রক্তাক্ত বীভৎস পাখিটাকে হয়তো খাবার মতলব করছে। বেড়ালটাকে তাড়াবে বলে আলো ফেলতেই চমকে উঠল অনীশ। এ কি সাধারণ বেড়াল? চোখ জ্বলছে, ঠোঁটভর্তি রক্ত। মনে হচ্ছে বুঝি বা একলাফে অনীশের টুঁটি চেপে ধরবে। অনীশ ছুটে পালিয়ে এলো নিজের ঘরে, নিজেকে তার অপরাধী মনে হতে লাগল। পাখিটার মৃত্যুর জন্যে সে নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না। প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে সারারাত না ঘুমিয়ে অনীশ যখন দালানে এলো, দেখল ভোরের আলো ফুটেছে—কিন্তু এ কি! পাখিটা কোথায়?

একবার ভাবল মালীকে বলে, কিন্তু বলে লাভ কি—বিশ্বাসই করবে না তো। কিন্তু সবটাই কি তার মনের ভুল! একথা যখন কাউকে বলা যাবে না—তখন তাকে নিজেকেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

রাত দুটো কি আড়াইটে—আবার সেই চিৎকার! অনীশের সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। সে আর ভয় পায় না। এর শেষ তাকে দেখতেই হবে। টর্চ নিয়ে ছুটে গেল অনীশ দালানের কোণে যেখানে পাখির খাঁচা থাকে। দেখল, খাঁচার দাঁড়ে রক্তাক্ত বীভৎস গলাকাটা পাখিটা বসে আছে—আর তার কাটা মুণ্ডুটা মাটিতে পড়ে ডাকছে—"কৌন আয়া হ্যায়?"

অনীশের সমস্ত শরীর কাঁপছে। একটা হিমশীতল প্রবাহ নেমে যেতে লাগল শিরদাঁড়া দিয়ে ওপর থেকে নিচে। অনীশ মরিয়া হয়ে লাঠি তুলে ধরল পাখির খাঁচার দিকে। ঠিক সেই সময় পাখির কাটামুণ্ডুটা, ছুটে এলো অনীশকে লক্ষ্য করে। অনীশের কপালে মারল এক ঠোক্কর। সঙ্গে সঙ্গে রক্তপাত। অনীশের মাথাটা ঘুরে গেল। ও দালানের মেঝেতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

তখনও ভোর হয়নি। অনীশের জ্ঞান ফিরে এলো। দেখল দালানেই সে পড়ে আছে। টর্চটা তখনও দুলছে টিমটমে আলো নিয়ে। অনীশ

কিছুতেই ব্যাপারটাকে মনের ভুল বলে উড়িয়ে দিতে পারছে না। হঠাৎ তার হাত পড়ল কপালে আর সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠল, হাতে চটচটে রক্ত নিয়ে। না, এতেই বোঝা গেল সবটা তার মনের ভুল নয়। এরপর আর ওখানে থাকা চলে না। অনীশ ঠিক করল ফিরে যাবে কলকাতায়।

স্টেশনে গাড়ির তখনও সময় হয়নি ছাড়বার। হাতে মাত্র দশ মিনিট সময়। মালীটা মালপত্র তুলে দিয়ে বিদায় নিতে চাইল। অনীশ ওর হাতে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়েই তুলে নিল। বলল, তোমার বকশিস। কিন্তু তার আগে বল—আমি থাকতে পারলুম না কেন?

—কাউকে বলবেন না বাবু। আমার তাহলে চাকরি যাবে। এখানে বিশ্বাসঘাতকদের কোনো ক্ষমা নেই বাবু।

—এর সঙ্গে তোমার চাকরি যাবার সম্পর্ক কি? জিজ্ঞেস করল অনীশ।

মালী বলল—খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেলে এ বাড়ি আর বিক্রিও হবে না। বাড়িতে কোনো লোকও এসে থাকতে চাইবে না।

অনীশ ওকে আশ্বাস দিয়ে বলল—কেউ জানবে না তুমি বল। এসব কি আমার মনের ভুল?

মালী বলল—না বাবু, ভুল নয়। বছর দু'এক আগে এ বাড়িতে এক বাবু এসেছিলেন। তাঁর শখ ছিল শিকার। একদিন দালানে বসে আছেন এমন সময় একটা পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে পড়ল তাঁর পায়ে। উনি পাখিটাকে একটা খাঁচায় পুরে রাখলেন। পাখিটা রোজ রাতে এমন চিৎকার করত যে তাঁর ঘুম হতো না। একদিন মাঝরাতে উনি পাখির খাঁচার দরজাটা খুলে দিলেন—যাতে উড়ে যায়। পোষমানা পাখি উড়ল না, একটা বেড়াল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিমেষের মধ্যে। পাখিটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল।

পরদিন সকালে দেখা গেল বাবুর খুব জ্বর—কপালে একটা ক্ষতচিহ্ন। সেদিনই গ্রামের হাসপাতালে খবর দেওয়া হলো। ওরাই নিয়ে গেল...মালী হঠাৎ চুপ করে গেল। তার চোখ অনীশের কপালের দিকে। ঝড়ের মতো ট্রেনটা স্টেশনে ঢুকে পড়ল। অনীশ মাকে নিয়ে ট্রেনের কামরায় উঠে বসল। জানালার ধারে মালী এসে দাঁড়াল। ট্রেন চলতে শুরু করল—অনীশ পঞ্চাশ টাকার নোটটা মালীর পকেটে ঢুকিয়ে দিল। নিমেষের মধ্যে ট্রেন স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে চলল কলকাতার দিকে।

# ২৫ বছর পরে

একগাদা চিঠির মধ্যে চোখে পড়ল একটা পুরনো খাম। অন্তত সাত-আট বছর আগের তৈরি তো বটেই। খামটার গায়ে কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা আমার নাম দেখে রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। তাড়াতাড়ি খামটা খুলে চিঠি পড়তে শুরু করলুম। কাগজটাও ময়লা। নিচে নাম লেখা 'সুমিত চন্দ্র'। খুব পরিচিত মনে হলো নামটা কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলুম না, সুমিত চন্দ্রের সঙ্গে আমার কবে কোথায় পরিচয় হয়েছিল। ভাবলুম চিঠিটা পড়ি—যদি বোঝা যায়।

ভাই মনোজিৎ,

নির্বান্ধব অবস্থায় পড়ে আছি বছরের পর বছর। আমি খুব অসুস্থ। সব সময় মাথার যন্ত্রণা হয়। শিমুলতলার এই বিশাল বাড়িটায় থাকার মধ্যে শুধু আমি আর আমার বোন। তাও বোন মৃত্যুশয্যায়। আমার পাশে এই দুর্দিনে কারোর থাকা দরকার। কিন্তু কে থাকবে? হঠাৎ

তোমার কথা মনে পড়ে গেল। চিরকালই তুমি ডানপিটে—ভয়ডর বলে তোমার কিছু নেই। তুমি এই সময় আমার পাশে থাকলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করব। আমাকে চিনতে পেরেছো তো? আমি...মোটা...

এইটুকু পড়েই চিনতে পারলুম সুমিতকে। আমার স্কুলের বন্ধু। আমাদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব ছিল। সুমিত ছিল ফর্সা গোলগাল নাদুসনুদুস ভালমানুষ। ওকে আমরা বন্ধুরা নাম দিয়েছিলুম "মোটা"। সেই নামেই ও আমাদের কাছে পরিচিত ছিল বলেই সুমিত নামটা চট্ করে মনে করতে পারিনি।

খামটা ভাল করে দেখতে অবাক হয়ে গেলুম। চিঠিটা শিমুলতলা থেকে পোস্ট করা হয়েছে এক বছর আগে। খামের দামটা বেড়েছে। কিন্তু সেভাবে স্ট্যাম্প দেওয়া হয়নি। ভাবলুম—তাই হয়তো পড়েছিল ডাকবিভাগে। তারপর দয়া করে কেউ সেটা পাঠিয়েছে। এতদিনে সুমিতের কি অবস্থা হলো কে জানে?

ঠিক করলুম কালই রওনা হব। ক্ষতি কি! বন্ধুর উপকারও করা হবে, বেড়ানও হবে। ক'দিনের ছুটি নিয়ে যাত্রা করলুম শিমুলতলার দিকে। পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। চিঠির তলায় ঠিকানা ছিল, স্টেশনে নেমে একটা রিকশাওলাকে ঠিকানাটা বলতেই সে কেমন করে যেন আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, ঐ যে বাবু অটো দাঁড়িয়ে আছে ওদের বলুন।

অগত্যা অটো ধরে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলুম যখন তখন প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়। অটো থেকে নেমে স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দিলুম। অটো চলে গেল। আমি দেখলুম আমার সামনে এক বিশাল বাড়ি। বাড়ির চারধারে পাথর, মরা গাছ, শুকনো কুয়ো, মাঝখানটা একটা ঢিপির মতো উঁচু। তার ওপর বাড়িটা। কি রং ছিল বাড়িটার এককালে আজ আর বোঝা যায় না। বাইরের অন্ধকার নেমে আসছে বাড়িটার ওপর, ছাতের পাঁচিলে বিরাট ফাটল। তার গা চিরে বিশাল অশ্বত্থ গাছের শেকড় নেমেছে। মনে হচ্ছে বুঝিবা ভেঙে পড়ল, গা ছমছম করতে লাগল। এ কোথায় এলুম! নাকে ভেসে এল একটা অশুভ রহস্যময় গন্ধ।

একবার মনে করলুম ফিরে যাই। কিন্তু ছোটবেলা থেকে সাহসী বলে আমার একটা সুনাম ছিল—সেই কথা মনে পড়তেই দৃঢ় পদক্ষেপে

এগিয়ে গেলুম বাড়িটার দিকে। সদর দরজা ভেজানো ছিল, হাত দিয়ে খুলতে যাব, নিজে থেকেই খুলে গেল। সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে। বোধ হয় কাজের লোক। বললুম—সুমিত আছে? আমি ওর বন্ধু।

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমার স্যুটকেসটা তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল। ওর পিছু নিলাম। মনে হলো লোকটা বোবা। দালানের পর দালান, ঘর ফেলে এগিয়ে চলেছি তো চলেছি। শেষে একটা প্রায় অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ল লোকটা। আমিও ঢুকলুম। ইলেকট্রিকের আলো নেই। মোমবাতিও জ্বলেনি। দেখলুম একটা ইজিচেয়ারের ওপর একটা মানুষের দেহ। এতক্ষণে চোখটা অন্ধকারে সয়ে গেছে—দেখলুম চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে একটা কঙ্কালসার দেহ। এই কি সুমিত? সেই কঙ্কালসার দেহে ঠোঁটটা নড়ে উঠল। বলল—মনোজিৎ এসেছ?

২৫ বছর আগে দেখা সেই সুমিতের সঙ্গে এই সুমিতের কত তফাৎ! সমস্ত চুল উঠে গেছে, চোখের কোল ঢুকে গেছে, সেই ফুলো গাল ভেঙে ঢুকে গেছে গর্ত তৈরি করে। বললুম—সুমিত, এ তোর কি চেহারা হয়েছে রে?

সুমিত হাসল। দেখলুম সে হাসিতে দাঁতহীন সুমিত আরও বীভৎস হয়ে উঠল। বলল—আজ দশ বছর ধরে ভুগছি। মাথার যন্ত্রণায় পাগল হতে বসেছি।

বললুম—চিকিৎসা করাসনি?

সুমিত বলল—করিয়েছি—কোনো কাজ হয়নি।

—কলকাতায় আমার কাছে চলে গেলি না কেন?

—পারিনি বোনের জন্যে। বিয়ের পরই নিঃসন্তান অবস্থায় সে ফিরে আসে। তারপরই কঠিন রোগে পড়ে। তাকে একা ফেলে যেতে পারিনি।

বললাম—কোথায় সে? কেমন আছে?

সুমিতের গলাটা কেঁপে উঠল, বলল—পাশের ঘরে। ঘণ্টাখানেক আগে তার মৃত্যু হয়েছে।

গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল। এই প্রায় অন্ধকার ঘরে একটা মৃতপ্রায় মানুষ আর পাশের ঘরে একটা মৃতদেহ—কি করে রাত কাটাব? বললুম—তোদের হ্যারিকেন নেই?

ও বলল—জোর আলো আমি সহ্য করতে পারি না, চোখে যন্ত্রণা

হয়। ঐ টেবিলের ওপর একটা সরু মোমবাতি আর দেশলাই আছে, একটু কষ্ট করে জ্বেলে নাও।

পেছন ফিরে লোকটাকে খুঁজলুম। সুমিত বলল—চলে গেছে। ওরা কেউ রাতে থাকে না।

উঠে গিয়ে ঘরের কোণে সরু মোমবাতিটা জ্বাললুম। ঘরটায় সামান্য আলো হলো। চোখ চলে গেল পাশের ঘরের দিকে। সেই ক্ষীণ আলোতে পরিষ্কার দেখা গেল পাশের ঘরের খাটের ওপর সাদা চাদর ঢাকা একটা দেহ।

বললুম—সৎকার করতে হবে তো?

সুমিত বলল—কাল সকালের আগে হবে না। এত রাতে লোকজন পাব কোথায়? তুমি যাও, হাত-মুখ ধুয়ে কাপড়জামা ছেড়ে ঐ টেবিলে খাবার ঢাকা আছে, খেয়ে নাও।

বললুম—তুই খাবি না?

ও বলল—আমার হজম হয় না বলে ডাক্তার বিকেলের মধ্যে খেয়ে নিতে বলেছে। আমার খাওয়া হয়ে গেছে। তুমি খেয়ে নাও।

সব কাজ সেরে খাটে এসে বসলুম। সুমিতও এসে বসেছে খাটে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলব কি, সমস্তক্ষণ চোখটা ঐ পাশের ঘরে চলে যাচ্ছে। আমার সামনেই মধ্যিখানের দরজা। তাই সোজাসুজি ঐ দিকেই চোখটা আটকে যাচ্ছে। প্রচণ্ড অস্বস্তি হতে লাগল। বুঝতে পারছি না কি করব, এমন সময় সুমিত বলল—দেখো আমরা এঘরে কথা বলছি—ওঘরে সুনীতির বোধহয় শান্তিভঙ্গ হচ্ছে। এক কাজ করি, দরজাটায় একটা তালা দিয়ে দি।

অবাক হয়ে বললুম, তালা কেন?

সুমিত বলল—ওটা ভাল বন্ধ হয় না। বহুদিনের দরজা তো, ফাঁক হয়ে থাকবে। একটা তালা লাগিয়ে দিলে খুলে যাবে না।

সত্যি বলতে কি খুব খুশি হলুম। মনে মনে সুমিতকে ধন্যবাদও দিলুম। সুমিত উঠল, একটা বিরাট তালা দিল দরজাটা বন্ধ করে। চাবিটা এনে রাখল বালিশের তলায়। কিন্তু দরজাটা বেশ ফাঁক হয়ে রইল। কি করা যাবে। পুরনো দরজা। মনটাকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা করতে লাগলুম। এমন সময় খস্‌খস্‌ শব্দ। কানখাড়া করে শুনল সুমিত। কে যেন আসছে মনে হলো।

সুমিত তড়িৎবেগে উঠে দাঁড়াল খাট থেকে নেমে। পাশের ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়তে আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হবার উপক্রম ঘটল। পরিষ্কার দেখলুম—সাদা চাদর ঢাকা সুনীতির মৃতদেহটা খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বন্ধ দরজার দিকে। সুমিত চিৎকার করে বলে উঠল—এ তো সুনীতির পায়ের শব্দ। এ শব্দ আমি চিনি। সে আসছে। আমি জানতুম সে আসবে, তাই তো দরজাটা বন্ধ করে রেখেছি।

আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি অন্ধকারের মধ্যে সাদা চাদর ঢাকা দেহটা দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। সুমিত পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। বলছে—সুনীতি, কালই আমি তোমার সৎকার করব বোন—তুমি একটু শান্ত হও।

আমি খাটের পেছনে নেমে দাঁড়িয়েছি। পালাতে চাইছি, পা দুটো আটকে গেছে ভারী হয়ে, নাড়াতে পারছি না। সুনীতি ক্রমাগত দরজা নাড়াচ্ছে। পরিষ্কার দেখলুম দরজার তালাটা ভেঙে পড়ল। হাট করে দরজা খুলে গেল। দমকা বাতাসে নিভন্ত মোমবাতি দপ্‌দপ্‌ করে নিভে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সুনীতির চাদরে ঢাকা শবটা ঝাঁপিয়ে পড়ল সুমিতের ওপর। একটা চিৎকার। তারপর সব শেষ।

ততক্ষণে ঘরের দরজা খুলে আমি ছুটতে আরম্ভ করেছি। পাগলের মতো ছুটছি তো ছুটছি। কতক্ষণ ছুটেছি জানি না। দিনের আলো চোখে পড়তে জ্ঞান এল। দেখলুম একটা বড় মাঠের মধ্যে আমি একা শুয়ে আছি। বুঝতে পারলুম এখানেই কালকে অটোটা আমাকে নামিয়ে দিয়েছিল। পাশে স্যুটকেসটাও পড়ে আছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই বিশাল বাড়িটা আর নেই—তার বদলে পড়ে আছে ইট-কাঠ-পাথরের বিরাট ধ্বংসস্তূপ।

# সেই চেয়ার

উল্টোডাঙার মোড়ে আসতেই চোখে পড়ল ছোট্ট একটা কাঠের দোকান। অপূর্ব কারুকার্য করা নানা ধরনের কাঠের ফার্নিচার সাজানো রয়েছে। ইন্দ্রনীল গাড়িটা কোথায় রাখবে ভেবে পেল না। শেষে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে ঘোরার পর একটা গলির মধ্যে গাড়িটা রেখে সে দোকানটার দিকে এগিয়ে গেল। এই অল্পবয়সেই ইন্দ্রনীল কলকাতার নামকরা ব্যবসায়ীদের একজন হয়ে উঠেছে। বাবা, মা, ভাই, বোন কেউ নেই তার। থাকার মধ্যে আছে বাপ-ঠাকুর্দার রেখে যাওয়া বিরাট সম্পত্তি আর বাবার আমলের বৃদ্ধ নায়েবকাকা—সহদেব চক্রবর্তী। বলতে গেলে তিনিই ইন্দ্রনীলের একমাত্র অভিভাবক।

ফার্নিচারগুলো দেখতে দেখতে একটা চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনীল। চেয়ারটা আগাগোড়া কারুকার্য করা। পুরু ভেলভেটের গদি, কিন্তু দেখতে বড় অদ্ভুত। ঠিক সাধারণ চেয়ারের মতো নয়। একটু

তেকোনা, তিনটে পা, কুচকুচে কালো রং। দেখলে মনে হয় সেকালের কোনো জমিদার বা রাজারাজড়াদের ঘরের জিনিস।

ক্যাশ-কাউন্টারে বসে থাকা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানল ইন্দ্রনীল, এটা কোনো একজন দিয়ে গেছেন বিক্রির জন্যে। ইন্দ্রনীল চেয়ারের দাম আর তার ঠিকানাতে চেয়ারটা পাঠিয়ে দেবার খরচ বাবদ টাকা মিটিয়ে গাড়িতে এসে বসল। মনটা তার আনন্দে ভরে গেছে। আসলে শৌখিন জিনিস দিয়ে ঘর সাজানো তার একটা নেশা। চেয়ারটা তার ভারি পছন্দ হয়েছে। ঠিক করল চেয়ারটাকে সে বাড়ির নিচের তলায় তার নিজস্ব বসার ঘরেই রাখবে।

গাড়ি চালাতে চালাতে ইন্দ্রনীল কল্পনা করতে লাগল, ঐ চেয়ারে বসে আছে এক জমিদার, নয়তো এক রাজা। হাতে গড়গড়ার নল, চুনট করা ধুতি, পাতলা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, আতরের গন্ধে ভরপুর চারদিক, চোখ বুজিয়ে মৌজ করছে। চারধারে প্রজাদের দল, নায়েব-গোমস্তা। জমিদারমশাই তাদের কথা শুনছেন বেশি, বলছেন কম। ইন্দ্রনীল ভাবল সেও অমনি করে চেয়ারে বসে কারখানার লোকেদের সঙ্গে কথা বলবে। ভাবতেই তার হাসি পেল।

গাড়ি লোহার গেট পেরিয়ে বাগানের সামনে এসে দাঁড়াল। ছুটে এল দরোয়ান আর ড্রাইভার জয়নাল। ইন্দ্রনীল ড্রাইভারের হাতে গাড়ির চাবি দিয়ে একতলার ড্রইংরুমের সোফায় গা এলিয়ে দিল। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবার পরে এল নিজের অফিসঘরে। নায়েব সহদেব চক্রবর্তী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ঢুকে বললেন—খোকা, আমাদের দেশের বাড়ি থেকে রামসদয় এসেছে। বলছে এবার আমাদের দুর্গাপুজো একশো বছরে পড়ল। ওরা একটু মেলাটেলা করে ধুমধাম করতে চায়।

ইন্দ্রনীল বলল—বেশ তো, করুক, আপনি এবার পুজোর ফান্ড আরও পাঁচ হাজার টাকা বাড়িয়ে দিন নায়েবকাকা।'

সহদেববাবু প্রসন্নমুখে পাকা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন—আর একটা কথা খোকা, আমাদের রঙের কারখানার কর্মচারী মোহন দাসের কন্যাদায়, ওকে সাত দিনের ছুটি দেবার কথা বলছে।

ইন্দ্রনীল না ভেবেই বলে—দিয়ে দিন। মেয়ের বিয়ে বলে কথা।

সহদেববাবু হেসে চলে যাচ্ছিলেন, ইন্দ্রনীল ডাকল, নায়েবকাকা, আমার মনে হয় মোহন দাসকে কিছু সাহায্য করা উচিত, তাই না?

সহদেববাবু বললেন—তা তো বটেই।

ইন্দ্রনীল বলল—এক কাজ করুন, ওকে দু' হাজার টাকা দিয়ে দিন, বলুন এটা আমাদের তরফ থেকে মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ।

সহদেববাবুর চোখ দুটো আনন্দে চকচক করে উঠল। গদগদ স্বরে বলে ওঠেন তিনি, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন বাবা। কন্যাদায়, মাতৃপিতৃদায়ে সাহায্য করার মতো পুণ্য কাজ আর কিছু নেই বাবা। ওরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, ডাকবো ওদের?

ইন্দ্রনীলের মনে পড়ল চেয়ারটার কথা। ভাবল, সেটা এলে তার ওপর বসে জমিদারের মতো কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করবে। একটা চাপা হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটে। মুখে বলল—আজ নয়, কাল সকালে ওদের আসতে বলুন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চেয়ার এল। ইন্দ্রনীলের নির্দেশে রিভলভিং চেয়ারের বদলে সেই চেয়ারটা টেবিলের সামনে জায়গা পেল। পরদিন সকালে ইন্দ্রনীল ঠিক সময়ে নিজের অফিসে এল। নতুন চেয়ারটার দিকে ভাল করে দেখল তারপর পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে একটা সিগারেট ধরিয়ে মৌজ করে বসল চেয়ারে। কিন্তু এ কি! চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগল। মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা কষ্ট, যেন রক্তচাপ বেড়ে চলেছে। একই সঙ্গে রাগ ও বিরক্তি তাকে অস্থির করে তুলল। ঠিক সেই সময় সহদেববাবুর সঙ্গে রামসদয় আর মোহন দাস হাসিমুখে ঘরে ঢুকল।

ইন্দ্রনীলের মুখে রাজ্যের বিরক্তি। রূঢ় কণ্ঠে বলে ওঠে—কে তোমরা, কি চাও?

সহদেববাবু বললেন—এরাই মোহন দাস আর রামসদয়।

রামসদয় বলে উঠল—গ্রামের লোকেরা আপনাকে দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করছে স্যার। এককথায় আপনি অতগুলো টাকা...

ওর কথা শেষ হলো না। চিৎকার করে উঠল ইন্দ্রনীল, চোপরাও! কে চেয়েছে তোমাদের আশীর্বাদ? এক পয়সাও বাড়তি দেওয়া হবে না জেনে রেখো। টাকা কি খোলামকুচি? পুজো তো করবে কত, সব তো ওড়াবে ফুর্তি করে। যাও, বিদেয় হও।

রামসদয়ের মুখটা অপমানে লাল হয়ে গেল। হয়তো কিছু বলতো কিন্তু ইন্দ্রনীল আবার ধমক দিল—যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন?

সহদেববাবুর মুখে কথা নেই। তিনি কি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখছেন! সদা হাস্যমুখ, দিলদরাজ, কোমল স্বভাবের মানুষটার হঠাৎ এ কি পরিবর্তন?

ইন্দ্রনীল রক্তবর্ণ চোখে তাকাল এবার মোহন দাসের দিকে। বলল—তোমার কি চাই?

মোহন দাসের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, কোনোরকমে বলল—আমার মেয়ের বিয়ের জন্য ছুটি...

কথা শেষ হলো না, চেঁচিয়ে উঠল ইন্দ্রনীল—হবে না, আর হলেও মাইনে ছাড়া ছুটি হবে। তোমার মেয়ের বিয়ে বলে তো আর আমার কারখানা ডকে তুলে দিতে পারি না!

সহদেববাবু এমন ইন্দ্রনীলকে চেনেন না। তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কোনোরকমে বললেন—কাল তুমি বলেছিলে ওকে কিছু টাকা...

যা কোনোদিন ভাবতে পারেনি ইন্দ্রনীল, সে তাই করল। ধমকে উঠল নায়েবকাকাকে। বলল—আপনি আজকাল কানে কম শোনেন নায়েবমশাই, এবার অবসর নিন।

সহদেববাবু লজ্জায় অপমানে মাথা নিচু করলেন। মোহন দাস কড়া কথা শোনাতে উদ্যত হলো। সহদেববাবু তার হাতটা চেপে ধরলেন। কোনো কথা আর না বলে ওরা দুজনেই বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ইন্দ্রনীল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মাথাটা হঠাৎ খুব হালকা হয়ে গেল। ও আর চলতে পারছে না, চেঁচিয়ে ডাকল—শুকদেব—

দৌড়ে এল শুকদেব, তার খাস পেয়ারের লোক। ইন্দ্রনীল কোনোরকমে ওকে ধরে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে খাটে শুয়ে পড়ল। প্রায় ঘণ্টা তিন-চার বাদে যখন স্বাভাবিক হলো ইন্দ্রনীল তখন ঘড়িতে চারটে বেজে গেছে। শুকদেব সামনেই ছিল। বাবুকে উঠতে দেখে এগিয়ে এল।

ইন্দ্রনীল বলল—শুকদেব, আমি এতক্ষণ ঘুমচ্ছি, তুই ডাকিস্‌নি? আজ আর কারখানায় যাওয়া হলো না। তুই বরং এক কাজ কর, নায়েবকাকাকে ফোনে বলে দে কাল সকাল দশটায় আমি প্রথমে রঙের কারখানা, তারপর রাবার ফ্যাক্টরিতে যাব। উনি যেন আমার সঙ্গে থাকেন।

শুকদেব মাথা নেড়ে চলে যায়।

পরদিন কারখানায় ঢুকতেই একটা থমথমে ভাব লক্ষ্য করল ইন্দ্রনীল। অন্যদিন ও ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানায়, আজও অভ্যর্থনা করল বটে কিন্তু হাসি নেই কারও মুখে। বিশেষ করে মোহন দাসের ব্যাপারটা তার আরও অবাক লাগছে। মেয়ের বিয়ের জন্য সে যে অত টাকা দিল, তার জন্যে এতটুকু কৃতজ্ঞতাও

দেখা গেল না মোহন দাসের মুখে। সহদেববাবু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর চোখের কোলে কালি, মুখ গম্ভীর। ইন্দ্রনীল খুব অবাক হলো। বলল—নায়েবকাকা, কারখানায় কি কোনো গণ্ডগোল হয়েছে? কেমন যেন থমথমে ভাব?

সহদেববাবু খুব নম্র গলায় বললেন—আমাকে এবার ছুটি দাও। বুড়ো হয়েছি, না জেনে কত অন্যায় করেছি, কিছু মনে কোরো না বাবা।

ইন্দ্রনীল সহদেববাবুর কাছে এগিয়ে এসে ওঁর হাত ধরে বলল—কি হয়েছে কাকা? আমি কি কোনো অন্যায় করেছি? এরকম তো কখনও আপনি বলেন না। আমার আর কে আছে বলুন আপনি ছাড়া? বাবা-মা গেলেন, আপনিও... বলতে বলতে চোখ ছলছল করে এল ইন্দ্রনীলের।

সহদেববাবু যেন ঠিক মেলাতে পারছেন না কালকের ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আজকের ইন্দ্রনীলকে। অবাক হয়ে বললেন—কাল তোমার কি হয়েছিল বাবা?'

ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে বলল—আমার? কি হয়েছিল? আমি তো জানি না!

সহদেববাবু বললেন—অপরাধ নিও না বাবা। কাল হঠাৎ তুমি আমাদের সকলকে বড় অপমান করেছ। মোহন দাস আর রামসদয়...

ইন্দ্রনীল বলে ওঠে—সে তো আমি বলে দিয়েছি নায়েবকাকা, মোহন দাসের সাত দিনের ছুটি আর নগদ দু' হাজার টাকা মঞ্জুর। আর রামসদয়কে পুজোর খরচ বাবদ—পাঁচ...। না, না, আপনি আর অমত করবেন না, কাকাবাবু। কি হবে আমার টাকা নিয়ে? যা আছে সাত পুরুষ চলে যাবে। কিন্তু কি যেন বলছিলেন, অপমান না কি...

সহদেববাবু কথা ঘুরিয়ে নিলেন। বললেন—না, কিছু নয়, আমারই ভুল হয়েছিল বোধহয়, বুড়ো হয়েছি তো, চল ফ্যাক্টরিটা ঘুরে আসি।

ইন্দ্রনীল খুশি হয়ে বলল—হ্যাঁ, চলুন।

পরের দিন সকালে বাড়িতে অফিসঘরে ঢুকেই ইন্দ্রনীল অবাক হয়ে গেল। একবাক্স মিষ্টি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সহদেববাবু হাসিমুখে। ইন্দ্রনীল হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার নায়েবকাকা, সাতসকালে মিষ্টিমুখের আয়োজন?

সহদেববাবু বললেন—কাল বাড়ি গিয়ে খবর পেলুম বড় ছেলে চার্টার্ড পাশ করেছে। তাই। ও নিজেই আসবে, কিন্তু আমার আর তর সইল না।

ইন্দ্রনীল সাগ্রহে সহদেববাবুর হাত থেকে মিষ্টি নিয়ে বলল—বিনোদ শুধু আপনার ছেলে নয় কাকাবাবু, আমার ভাই। এবার তাকে আমার পাশে পেলে আমি কিন্তু খুব খুশি হব। বলতে বলতে সেই চেয়ারে বসল ইন্দ্রনীল। সঙ্গে সঙ্গে মুখচোখের চেহারা বদলে গেল। ভ্রূ কুঁচকে প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে ও তাকাল সন্দেশের বাক্সটার দিকে। সহদেববাবু কিন্তু তা লক্ষ্য করেননি। তিনি টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে চলেছেন—বিনোদ তোমার কাছে চাকরি করবে, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।

বাঃ, চমৎকার! ইন্দ্রনীলের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন সহদেববাবু। তাই বুঝি সন্দেশের বাক্স এনে ঘুষ দিচ্ছেন! নিজে হচ্ছে না, এবার ছেলেকেও ক্যাশে এনে ঢোকাতে চান। আপনার তাতে খুব সুবিধে হবে, না? শুনুন, একটা কথা মনে রাখবেন নায়েবমশাই, জমিদার-বংশের কেউ চাকরের হাতে মিষ্টি খায় না। নিয়ে যান আপনার বাক্স।

সহদেববাবুর মাথায় রক্ত উঠে গেল। তিনি সন্দেশের বাক্সটা ওয়েস্টপেপার বক্সের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ইন্দ্রনীলের মুখটা রাগে লাল। শরীর কাঁপছে। চিৎকার করে উঠল—

শুকদেব—

চিৎকার করে উঠল বটে কিন্তু শুকদেব এসে পৌঁছবার আগেই ইন্দ্রনীল অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

এরপর ডাক্তার-বদ্যি, হুলুস্থুল কাণ্ড। সহদেববাবুও না এসে পারলেন না। তাঁর মনে একটা সন্দেহ উঁকি মারতে লাগল। তিনি সবার অলক্ষ্যে ইন্দ্রনীলের চেম্বারে এলেন। চেয়ারে বসেই উঠে পড়লেন। একটা যেন শক্ লাগল। সহদেববাবু তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করতে লাগলেন চেয়ারটা। হঠাৎ এক জায়গায় তাঁর চোখটা আটকে গেল। চেয়ারের পেছনে ছোট্ট করে লেখা আছে 'জে. বি.'। চমকে উঠলেন সহদেববাবু। এ চিহ্ন তাঁর অত্যন্ত পরিচিত। নয়নপুরের অত্যাচারী জমিদার জয়নারায়ণ বসুর কাছে তাঁর বাবা কাজ করতেন। ছোটবেলাটা কেটেছে তাঁর ঐ গ্রামেই। তারপর জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে জগন্নাথ বসু, বাবার চেয়েও অত্যাচারী হয়ে উঠলেন। গ্রামের প্রজারা শেষকালে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহ করল। সেই সময় ওঁরা পালিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। পরে শুনেছিলেন নিঃসন্তান অবস্থায় জগন্নাথ মারা যান। কে বা কারা তাঁকে খুন করে পুকুরে ভাসিয়ে দিয়েছিল বলে শোনা যায়। এরপর নয়নপুরে জমিদারবাড়ির সবকিছু নয়-ছয় হয়ে যায়।

সহদেববাবুর বাবা যখন ইন্দ্রনীলের ঠাকুর্দার কাছে কাজ নিলেন তখন সহদেববাবুর বয়স কুড়ি-বাইশ। কিন্তু এই চিহ্ন চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। সহদেববাবু আবার তাকালেন চিহ্নটার দিকে। মনে পড়ল নয়নপুরের জমিদারবাবুর বাড়ি ঢোকার আগে সিংদরজার মাথার ওপর এই চিহ্ন খোদাই করা ছিল। মনে পড়ল তাঁর বাবার সঙ্গে গেলে সব সময় তিনি লক্ষ্য করতেন চিহ্নগুলো। সমস্ত জায়গায় এই চিহ্ন তাঁকে কৌতূহলী করে তুলত। চেয়ারটাও তিনি চিনতে পারছেন এবার। হ্যাঁ, এই সেই চেয়ার। সভাঘরের একপাশে এই চেয়ারটা থাকত। দু'পাশে প্রজারা, চেয়ারে বসতেন জমিদার, তাঁর ডান পাশে নায়েব, বাঁ পাশে ইয়ার-বক্সুর দল। কিন্তু এটা কি অভিশপ্ত চেয়ার? নয় তো ইন্দ্রনীল এই চেয়ারে বসলেই বদলে যাচ্ছে কেন? সহদেববাবু এই প্রথম ইন্দ্রনীলকে না জানিয়ে একটা কাজ করে ফেললেন।

পরদিন সকালে ইন্দ্রনীল নিজের চেম্বারে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল। এ কি! তার সদ্য কেনা নতুন চেয়ারের বদলে পুরনো চেয়ার কেন? কে করল এ কাজ? চোখে পড়ল টেবিলের ওপর চাপা দিয়ে রাখা একটা চিঠি। বিরক্ত হয়ে ইন্দ্রনীল চিঠি খুলে পড়তে লাগল। চিঠিটা সহদেববাবুর। তিনি লিখেছেন—

'তোমার অনুমতি ছাড়াই চেয়ার সরিয়েছি। এর জন্যে যা শাস্তি দেবার দিও, মাথা পেতে নেব; তবু আমার প্রিয় ইন্দ্রনীলকে এই অভিশপ্ত চেয়ারে বসে আমি কিছুতেই নয়নপুরের অত্যাচারী জমিদার জগন্নাথ হয়ে যেতে দেব না। বুড়ো হয়েছি, এবার আমায় ছুটি দাও। হ্যাঁ, একটা কথা, চেয়ারটা নিচের গোডাউনে রেখেছি। দেখবে ওতে 'জে. বি.' লেখা। তাহলেই সব বুঝতে পারবে। ব্যাপারটা তো তোমারও অজানা নয়!'

পড়তে পড়তে ইন্দ্রনীলের মুখের চেহারা বদলে গেল। পুরনো চেয়ারে বসে একচোখ জল নিয়ে নিজের মনে বলল ইন্দ্রনীল—কাকাবাবু, ইন্দ্রনীলের কেউ নেই, শুধু তুমি আছ। তোমাকে আমি হারাতে চাই না কাকাবাবু, কোনোদিন না, কখনও না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল ইন্দ্রনীলের গাড়িটা ছুটে চলেছে সহদেববাবুর বাড়ির দিকে।

# মাটির নিচে

কোটি কোটি টাকার মালিক মহেশ চক্রবর্তী। টাকাই আছে, শান্তি নেই। নিজের বলতে ছিল একটা মেয়ে, স্ত্রী তো কবেই গেছেন—মেয়েটাও হঠাৎ চলে গেল কদিনের জ্বরে। এখন তিনি বড় ক্লান্ত। অবসন্ন। ব্যবসা আর ভাল লাগে না। কার জন্যে ব্যবসা আর কার জন্যেই বা টাকা! এখন তিনি বিশ্রাম চান। কলকাতার একটু বাইরে—একটা ছোট্ট বাগানবাড়ি হলে তিনি গিয়ে সেখানেই থাকতে পারেন। কিন্তু ঠিক সেরকম জায়গা তিনি পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ একদিন কাগজে দেখলেন কলকাতা থেকে মাইল দশেক দূরে বীরগ্রাম। সেখানে ২০ কাঠা জমির ওপর একটা ছোট্ট পাকা বাড়ি জলের দরে বিক্রি করতে চায় অঘোর প্রামাণিক নামে এক ভদ্রলোক। মহেশবাবু জায়গাটা দেখে দারুণ খুশি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ৭ দিনের মধ্যে তিনি ঐ জায়গার মালিক হয়ে গেলেন। চারদিক ঘিরে বাগান তার মধ্যে চমৎকার একটা দোতলা মোজাক মার্বেলের বাড়িও তৈরি হয়ে গেল। বাড়ির নাম দিলেন 'নিরালা'।

ঢুকতেই লোহার গেট। তার দু'পাশে ইউকালিপটাস গাছ—বাগানবিলাসের বাহার। গেট পেরিয়ে পাথরকুচো ছড়ানো সরু রাস্তা—একেবারে বাড়ির সদরে এসে থেমেছে। চারদিকে গাছের সারি—কিন্তু মধ্যিখানটায় হাত দিলেন না—ফাঁকাই রাখলেন। ঠিক করলেন—তাঁর তো কেউ নেই—ঐ জায়গাটাকে পার্কের মত সাজাবেন। দোলনা, সি স, বাঘবন্দী নানারকম করবেন—ছেলেরা আসবে, ছুটবে, দৌড়বে, খেলবে—তিনি দেখবেন। তার একধারে একটা ঘেরা জায়গায় একটা সুইমিং পুল থাকবে। গ্রামের বাচ্চারা সেখানে সাঁতার শিখবে। আনন্দ করবে।

গ্রামের দু'একজন মাতব্বর বললেন—সুইমিং পুলে সাঁতার শিখবে গ্রামের ছেলে! কেন? পুকুর আছে তো।

মহেশবাবু ধমকে উঠলেন তাদের।

—তা আছে, ম্যালেরিয়ার ডিপো ঐ পুকুরগুলোতে বাচ্চাগুলো না চুবলে ম্যালেরিয়া হবে কি করে বলুন! আমি কলকাতা থেকে সাঁতারু করুণাময় দত্তকে নিয়ে আসব। তিনি ছেলেদের ছোট থেকে সাঁতারু তৈরি করার চেষ্টা করবেন। বলা যায় না ভবিষ্যতে ওরা অলিম্পিকে নাম করতে পারে।

কথামতো কাজ শুরু হলো। সব ঠিক চলছিল। কিন্তু পুকুর তৈরি করতে গিয়ে নানা বিপত্তি দেখা দিতে লাগল। নরম মাটি কিন্তু কিছুতেই কাটা যাচ্ছে না। মহেশবাবু অন্য ব্যবস্থা করলেন, মেশিন দিয়ে পুকুর কাটলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য তাতেও দু'বার মেশিন আটকে গেল। অবশেষে কাজ শেষ হলো। এক অপূর্ব মনভরানো চোখজুড়নো বাগানবাড়ি হলো মহেশবাবুর।

ঠিক হলো ১লা আগস্ট থেকে পার্কটা গ্রামবাসীদের জন্যে খুলে দেওয়া হবে। তবে সুইমিং পুলে ঢুকতে গেলে সামান্য খরচ করতে হবে। গ্রামের লোকেরা এতে একটু অবাক হলো। মহেশবাবু ওদের বুঝিয়ে বললেন—

সুইমিং পুলে নামতে গেলে আগে পরিষ্কার জলে চান করে নামতে হয়—আবার উঠেও চান করতে হয়—এর জন্যে আর জল নিয়মিত পরিষ্কার করার জন্যে একটা খরচ আছে। তিনি চান—ভবিষ্যতে এই পার্ক আর পুল দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রামের স্থানীয় ছেলেদের ওপরই। তখন এইসব খরচ চালাবার অভাবে সবটাই বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে এর থেকে যা আয় হবে তাতে সৎভাবে সবকিছুই চালিয়ে যাওয়া যাবে ভালভাবে।

গ্রামের লোকেরা ধন্যি ধন্যি করতে লাগল মহেশবাবুকে। এমন নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু হঠাৎ আবার একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। সেদিনটা ছিল বুধবার। কলকাতা থেকে মহেশবাবু সাঁতারু করুণাময় দত্তকে এনেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে করুণাময়বাবু সোম আর বুধবার সাঁতার শেখাতে রাজী হয়ে গেলেন। তবে কথা হলো সপ্তাহের বাকি দিন শেখাবে তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য "বিজয় চন্দ্র"।

বেশ কিছু ছাত্র জমা হয়েছে। করুণাময়বাবু পরিষ্কার জলে চান করে জলে নামলেন। আর তখুনি সেই সাংঘাতিক ঘটনাটা ঘটে গেল। কে যেন তাঁর পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়। এত টান এই আধকোমর জমা জলে যে থাকতে পারে—করুণাবাবুর কাছে এ যেন অকল্পনীয়। নামকরা সাঁতারু, ব্যায়ামবীর, ছ'ফুট লম্বা একটা মানুষ আধকোমর জলের তলায় তলিয়ে যেতে লাগলেন অসহায়ের মতো। চিৎকার করে উঠলেন করুণাময়, বিজয়...বাঁচাও!

বিজয় ছিল পার্কে। ঘুরে ঘুরে দেখছিল জায়গাটা। এই অজ পাড়াগাঁয়ে এ যেন স্বপ্নপুরী। এমন সময় করুণাবাবুর আর্তস্বর তার কানে পৌঁছল। একছুটে চলে এলো বিজয়—সুইমিং পুলের সামনে দেখল জলের তলায় পড়ে আছে করুণাময়ের প্রাণহীন দেহ।

সবাই অবাক হয়ে গেল এই ঘটনায়। করুণাবাবু কি অসুস্থ ছিলেন? নয়তো কোনো সাঁতারু কখনও এমনভাবে জলে ডুবে মরতে পারবে না। বিশেষ করে আধকোমর জলে। তবে কি তিনি অসুস্থ ছিলেন? না পায়ে শির টেনে ধরেছিল? করুণাবাবুর দেহটা পোস্টমর্টেম করা হলো—কিন্তু তাঁর অসুস্থতার কোনো রিপোর্ট পাওয়া গেল না। তা কিছু না হোক তিন মাস কেটে গেল এসব ঝামেলায়। তিন মাস পরে করুণাবাবুর জায়গায় বিজয় এল সাঁতার শেখাতে। কিন্তু ছাত্রসংখ্যা আগের চেয়ে অনেক কমে গেল। গ্রামের অন্ধ সংস্কার—কেউ আর পুলে নামতে রাজী নয় সন্ধ্যের পর থেকে।

দুজন ছিল। বিজয় জলে নেমে ডাকল, আয়—নেমে আয়—

ছেলেরা নামার আগেই হঠাৎ দেখা গেল বিজয় তলিয়ে যাচ্ছে জলের নিচে। এবার সবার টনক নড়ল। মহেশবাবু ছুটলেন পাশের গ্রামে অঘোর প্রামাণিকের বাড়ি। বাড়িতেই ছিলেন তিনি। মহেশবাবু তখন হাঁপাচ্ছেন। অঘোরবাবু বললেন—বসুন মহেশবাবু। আপনার যা জিজ্ঞেস করার করে নিন। আমি জানতুম আপনি আসবেন।

—আপনি জানতেন আমি আসবো?—অবাক হলেন মহেশবাবু।

অঘোরবাবু বললেন—অতবড় জায়গা সামান্য টাকায় কেন আমি বিক্রি করে দিয়েছি—এটাই তো আপনার জিজ্ঞাস্য? তাই না মহেশবাবু!

মহেশবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন—হ্যাঁ ঠিক তাই। দয়া করে বলবেন আপনার রহস্যটা?

অঘোরবাবু বললেন—ভেবেছিলাম জায়গাটা আমার সহ্য হচ্ছে না। তাই বলে অন্যেরও যে হবে না এটা ভাবতে পারিনি।

—সহ্য হলো না মানে?—জিজ্ঞেস করলেন মহেশবাবু।

অঘোরবাবু বললেন—জমিটা ছিল আমার মামাতো ভায়ের। তার একমাত্র সন্তান গগন রাজনীতি করতে লাগল—তারপর হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয়ে গেল। মামাতো ভায়ের ঐ ছেলে ছাড়া আর কেউ ছিল না। মনের দুঃখে সেও আত্মঘাতী হলো। যাবার আগে একটা চিরকুটে জমিটা আমাকে দানপত্র করে দিয়েছিল। আমি খুব গরীব মানুষ। মনে করেছিলুম—জমিটায় কিছু ধানচাষ করে জীবনটা কাটিয়ে দেবো। তাই আমি, আমার মেয়ে-ছেলে সকলে একদিন ভাড়া ঘর ছেড়ে উঠে এলাম ঐ বাড়িতে। কিন্তু রোজ রাতে আমরা একটা কান্নার শব্দ শুনতে পেতুম। গ্রাহ্য করিনি। একদিন সন্ধ্যে হবার ঠিক আগে কিছু গাছ এনে পুঁতবো বলে মাটিটা গর্ত করতে গিয়ে দেখি এত শক্ত যে ধারালো খোঁচা দিয়ে আঘাত করলেও কিছু হচ্ছে না। অবাক হয়ে মাটিতে হাত দিয়ে গর্ত করে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা কি! সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো গরম চটচটে তলতলে কি যেন হাতে লাগল। হাতটা তুলে চোখের সামনে ধরতে চমকে উঠলুম! এ কি! চাপ চাপ রক্ত। কি করে লাগল আমার হাতে? আবার মাটির দিকে তাকালুম—কোথাও কিছু নেই—কিন্তু হাতের রক্তটা তো মিথ্যে বলবে না। কি না কি লেগেছে, রক্ত মনে করছি ভেবে আবার হাত দিতেই ইলেক্ট্রিক শক্ লাগার মতো চিনচিন করে উঠল হাতটা। তবে কি সাপে কামড়াল? ছেলে তখুনি গ্রামের হাসপাতালে নিয়ে গেল। ওরা বলল—সাপ না। তবে কি? বুঝতে পারল না ওরা। কিছু না বলে ছেড়ে দিল। কিন্তু আমার আর ভরসা হলো না ওখানে থাকতে।

মহেশবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—দয়া করে কথাগুলো যদি আমাকে বলে রাখতেন তবে...

অঘোরবাবু ভেঙে পড়লেন। বললেন—আমি জানি আপনি তাহলে নিতেন না, কিন্তু আমি যে বড় গরীব মহেশবাবু—ঐ জমি বিক্রির

টাকার লোভটা সামলাতে পারলুম না। অন্তত ঐ টাকায় একটা মাথা গোঁজার মতো আস্তানা তো পেয়েছি।

মহেশবাবু বললেন—তবু বলবো কাজটা ভাল করলেন না। আমি এত খরচ করে পুল তৈরি করলুম—আবার ভাঙতে হবে। এতে প্রচুর টাকা লোকসান হবে।

অঘোরবাবু অবাক হয়ে বললেন—কেন ভাঙতে হবে কেন?

মহেশবাবু বললেন—আমি এর শেষ দেখতে চাই অঘোরবাবু। দু' দুটো প্রাণ চলে গেল—আর আমি চুপ করে থাকবো? সে যেই হোক আমি তাকে ছাড়বো না। বলে দিলুম।

আশ্চর্য! পুলের নিচেটা ভাঙবার সময় কিন্তু কোনো বাধা এলো না। কিছুটা খুঁড়তেই পাওয়া গেল একটা নরকঙ্কাল। হাতে একটা লাল পাথরের আংটি। ততক্ষণে সারা গ্রাম ভেঙে পড়েছে 'নিরালা'র সামনে। মহেশবাবুর আদেশে তাঁর ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল পাশের গ্রাম থেকে অঘোর প্রামাণিককে নিয়ে আসার জন্যে। অঘোরবাবুকে নিয়ে আসা হলো পুলের সামনে—আঁতকে উঠলেন তিনি। তাঁর দৃষ্টি কঙ্কালের হাতের আংটিটার দিকে। তিনি দৌড়ে গিয়ে মহেশবাবুর হাত ধরে কেঁদে উঠলেন—ভাই মহেশবাবু—এই আমার সেই হারিয়ে যাওয়া ভাইপো গগন মণ্ডল। বলেছিলুম না রাজনীতি করতো? এই তার পরিণতি দেখুন।

সবাই বুঝতে পারল গগনের অতৃপ্ত আত্মা মুক্তির জন্যে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেউ বুঝতে না পারায় আক্রোশবশত হত্যার পথই বেছে নিয়েছিল এবার।

যাদের গৃহপ্রবেশে বলবেন ভেবেছিলেন তারাই এলো গগনচন্দ্রের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে। পুজো হলো, শান্তি-স্বস্তেন করার পর গগনের কঙ্কালটার সৎকার করা হলো।

মহেশবাবু পুকুর বুজিয়ে গাছ পুঁতলেন। গাছের তলায় বেদী করলেন বসার জন্যে। এরপর থেকে কোনো অঘটন ঘটেনি।

# ভুডু ডল

অদ্ভুত ধরনের প্রাচীন জিনিস সংগ্রহের একটা নেশা আছে অমরের। তাই যখন ওর কাকার আফ্রিকা যাবার কথা শুনল অমর, আনন্দে নেচে উঠল। কাকা মনোতোষবাবু একটা বিলিতি কোম্পানিতে কাজ করেন। প্রায়ই তাঁকে বিদেশে যেতে হয়। আর যখনই ফেরেন অমরের জন্যে কিছু না কিছু অদ্ভুত জিনিস নিয়ে আসেন। সুতরাং এবারও যে কিছু আসবে তাতে অমর নিঃসন্দেহ। এলোও। মনোতোষবাবু অমরের সামনে একটা লম্বা বাক্স রেখে বললেন—খোল।

অমর তাড়াতাড়ি প্যাকেট খুলে, বাক্সর ঢাকা খুলতেই চমকে উঠল। একটা পুতুল। আফ্রিকানদের মতো সাজ, দেখতেও। কিন্তু কেমন যেন বীভৎস। অমর ভালো করে লক্ষ্য করল—বীভৎস হচ্ছে পুতুলটার চোখ দুটো। কি নৃশংস দৃষ্টি! অমর একটু দমে গেল। কাকা তার জন্যে আফ্রিকান পুতুল এনেছেন! এটা তো আর প্রাচীন সংগ্রহের মধ্যে পড়ে না।

অমরের মুখ দেখেই বুঝেছেন ব্যাপারটা মনোতোষবাবু। বললেন—তুমি মনে করছো এটা তোমাকে শুধু সাজিয়ে রাখবার জন্যে দিয়েছি তাই না?

অমর একটু মনমরা হয়ে বলল—আমি ভেবেছিলুম তুমি দারুণ কিছু আনবে।

মনোতোষবাবু একটু হেসে বললেন—অমর, তোমার কিউরিওতে যত দুর্লভ সংগ্রহ আছে তার মধ্যে জানবে এটাও কম মূল্যবান নয়। বরং বলতে পারি, এধরনের সাংঘাতিক বস্তু তোমার সংগ্রহে এখন যেমন নেই, পরেও কোনোদিন থাকবে কিনা সন্দেহ।

রীতিমতো ভাবনায় পড়ল অমর। কি এমন জিনিস কাকা এনেছেন, তার মধ্যে কি এমন থাকতে পারে যা কাকাকে রীতিমতো উত্তেজিত করেছে! অমর নড়েচড়ে বসে। বলে, আমাকে বল না কাকা কি ব্যাপার! আমি তো দেখছি এটা একটা পুতুল মাত্র।

মনোতোষবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে অমরকে বললেন—শোন অমর, আমি তোমাকে সব খুলেই বলব—যাতে সব জানা থাকলে তুমি এই পুতুলটাকে সাবধানে রাখতে পারবে। এটা দেখতে সাধারণ হলেও সাংঘাতিক। আফ্রিকানরা একে বলে "ভুডু ডল"। হাইতির বহু প্রচলিত এক পদ্ধতি—যা দিয়ে ওরা শত্রু বধ করে।

অমর ছোট্ট করে হাসল—কাকা! পুতুল দিয়ে সত্যি সত্যি কোনো শত্রুকে বধ করা যায় না।

—যায়। গম্ভীর হয়ে বললেন মনোতোষবাবু।—তবে শোন, এই পুতুলটাকে ওদেশের ওঝারা প্রথমে মন্ত্রপূত করে। তারপর কোনো শত্রুর ব্যবহৃত কোনো জিনিস বা তার নখ অথবা চুল কেটে লাগিয়ে দেওয়া হয় এর গায়ে। তারপরই এই পুতুল হয়ে ওঠে জীবন্ত এক মরণদূত। যদি শত্রুকে বধ করার প্রয়োজন হয় তাহলে যেভাবে বধ করা হবে পুতুলটাকে, শত্রুটিও ঠিক সেভাবে মরবে।

—মানে?—অমর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—মানে, বললেন মনোতোষবাবু, তুমি যদি ওর গলাটা ছুরি দিয়ে কেটে দাও তবে হাজার মাইল দূরে থাকলেও সেই শত্রুর গলা কেটে পড়ে যাবে। অথবা যদি তুমি ওর পেট...

থামিয়ে দিল অমর। বলল, চুপ কর কাকা। কি বীভৎস! এ কি সত্যি? না গল্পকথা? এমনও হতে পারে?

—পারে। পারে বলেই তো তোমার দুর্লভ সংগ্রহে রাখার জন্যে ওকে নিয়ে এসেছি। তবে সাবধান অমর। কোনোদিন যেন ভুল করেও এর সত্যি-মিথ্যে যাচাই করতে চেষ্টা করো না। ভুল মন্ত্র বা ভুল পদ্ধতি কিন্তু উল্টো ফল দেবে। যে শত্রু বধ করার জন্যে একে ব্যবহার করছে—তারই মৃত্যু ডেকে আনবে।

—না—না কাকা। এসব কেউ করে? এ যে সাংঘাতিক জিনিস।

—মনে রেখো, ভুলো না যেন। মনোতোষবাবু বারবার সাবধান করে দেন অমরকে।

পরদিন ছিল রবিবার। অমরদের পাড়ার ক্লাবে আজ জোর মিটিং। সামনে বিশ্বকর্মা পুজো। প্রত্যেকবার এই দিন ওরা নাটক করে—নানারকম গানবাজনা করে। এবার এখনও পর্যন্ত কোনো নাটক ঠিক হলো না। যে নাটকই ঠিক হয়—বিভিন্ন মতামতে ভেস্তে যায়। মিটিং-এ সবাই খুব উত্তেজিত।

মানিকের আনা একটা নাটকের বই এইমাত্র রজত বরবাদ করে দিল। ইন্দ্রনীল ওদের মধ্যে একটু বয়স্ক। প্রতিবারেই নাটক ওই পরিচালনা করে। একবার টিভিতে নাটকও করেছিল। এইসব গণ্ডগোল দেখে বলে ওঠে ইন্দ্রনীল—ভাল থিম না হলে নাটক করব না।

জগু বলে—বাংলাদেশ থেকে কি সব লেখকরা হাওয়া হয়ে গেল? একটা ভাল গল্প নেই! নতুন কিছু দিতে পারে না, কেবল পলিটিক্স, নয় সংসারের প্যানপ্যানানি। দূর দূর...।

এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল অমর। এবার নড়েচড়ে বসল। বলব বলব করে একটু ইতস্তত করে বলে ফেলল—আমি তোমাদের একটা নতুন ধরনের গল্প...না-না সত্যি কাহিনী শোনাতে পারি। ইন্দ্রনীল যদি লিখতে পারে তবে চারদিকে হৈ হৈ পড়ে যাবে।

ইন্দ্রনীল নড়েচড়ে বসে বলল, শোনা তো আগে।

জগু বলল—ভাল থিম হলে লেখকের অভাব?

অমর বলতে শুরু করল। ঠিক যেমনটি শুনেছিল কাকার কাছে, তেমনি করে বলল।

তার কথা শেষ হবার পর মিনিট পাঁচেক কেউ কথা বলতে পারল না। স্তব্ধ হয়ে বসে রইল পুরো ক্লাবটা।

নীরবতা ভাঙল ইন্দ্রনীল। টেবিল চাপড়ে বলল—এটাই এবারের নাটক হবে। ফাইন্যাল। তোমরা রাজী?

একবাক্যে চেঁচিয়ে ওঠে সকলে—রাজী।

মানিক বলল—কিন্তু ঐ পুতুলটাকে কি নাটকে ব্যবহার করতে পারবো?

—কক্ষণো না—দৃঢ় স্বরে প্রতিবাদ করল অমর। তাহলে এ নাটক বন্ধ।

জগু মধ্যস্থ হয়ে বলল—দরকার কি! ঐরকম দেখতে একটা পুতুল বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসব এখন।

অমর বলল—ঐ রকম নয়—ঐ ধরনের। ওরকম পুতুল এখানে পাওয়া শক্ত।

ইন্দ্রনীল সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলল—পুতুলের ব্যাপারটা পরে ভাবা যাবে। আগে গল্পটা তো লেখা হোক। ঠিক হলো দিন সাতেক পরে গল্পটা নিয়ে বসা হবে।

ঠিক সাতদিন পর একটা ছোটখাট ম্যানস্ক্রিপট নিয়ে হাজির হলো ইন্দ্রনীল। তার পরিচিত নাট্যকার অনিরুদ্ধ পালকে বলতেই তিনি দারুণ উৎসাহে নাটকটা লিখে ফেলেছেন। ইন্দ্রনীল বলল—তোমরা সবাই বোস, আমি তোমাদের গল্পটা পড়ে শোনাচ্ছি। কোনো জায়গায় যদি কারো আপত্তি থাকে জানাবে—অসুবিধে না থাকলে বদলে দেওয়া যাবে।

শুরু হলো গল্প পড়া।

এক আফ্রিকান ওঝা। তার কাজ হলো এই ভুডু ডল দিয়ে শত্রু বধ করা। এর জন্যে সে মোটামোটা টাকা রোজগার করে। একদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন ওঝার কাছে। বললেন, তিনি বহু টাকার সম্পত্তির মালিক কিন্তু অপুত্রক। আছে বহু দূর সম্পর্কের এক ভাইপো। তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি সেই পাবে। কিন্তু ছেলেটি খুব খারাপ হয়ে গেছে। সম্পত্তির লোভে সে খুন করতে চাইছে বৃদ্ধকে। দুবার তিনি বেঁচে ফিরে এসেছেন কিন্তু এভাবে কি করে তিনি বাঁচবেন? তাই তিনি চান ছেলেটিকে...না মৃত্যু নয়—ছেলেটির পা দুটো পঙ্গু হয়ে যাক—তাহলে অন্তত কটা দিন তিনি সুস্থ হয়ে বাঁচতে পারবেন।

ওঝা বলল—পঙ্গু করা শক্ত—তবে পা দুটো কেটে দিতে পারা যায়। অথবা ভেঙেও দেওয়া যায়। কিন্তু পঙ্গু করার জন্যে যে মন্ত্র দরকার সে বিদ্যে তার নেই।

অনেক কথা কাটাকাটির পর ঠিক হলো মোটা টাকা পেলে ওঝাটি অন্য এক বড় ওঝা দিয়ে বৃদ্ধের ইচ্ছে পূরণ করতে পারে।

অন্যদিকে বৃদ্ধের সেই ভাইপোটিও এলো ঐ একই ওঝার কাছে বৃদ্ধের মৃত্যুকামনা নিয়ে। প্রচুর টাকার লোভ দেখাল। বলল—সে যদি মোটা টাকার সম্পত্তি লাভ করে, তার এক তৃতীয়াংশ সে দেবে ওঝাকে। ওঝাটি এই টোপটা গিলে ফেলল। কিন্তু ঝামেলা হলো বড় ওঝাকে নিয়ে। সে কিন্তু ইতিমধ্যে ভদ্রলোকের কথামতো কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

এই নিয়ে চলল নাটকে ওঠা-নামা—আর একটু একটু করে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলা। শেষে ক্লাইমেক্স। দেখা গেল—বৃদ্ধটি এবং তার ভাইপোটি উভয়কেই প্রায় একসঙ্গে মরতে হলো।

গল্প শুনে সকলে খুব খুশি। দারুণ নতুনত্ব। ঠিক হলো ইন্দ্রনীল ওঝা হবে। অমর হবে বড় ওঝা। বৃদ্ধ হবে জগু আর মানিক হবে ভাইপো। প্রধান প্রধান চরিত্র ভাগ হয়ে যাবার পর ছোটখাট চরিত্রগুলো দেওয়া হলো অন্যদের। ঠিক হলো পরদিন থেকেই রিহার্সাল শুরু হবে।

এবার ইন্দ্রনীল অমরের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার পুতুলটা কিন্তু একবার কাল এনো, ওটা সবাই দেখুক। নাটকে উৎসাহ আসবে তাহলে সবার। তাছাড়া পুতুলটা দেখাও দরকার সবারই। ঠিক ঐরকম একটা পুতুল যে পারবে—আনবে।

অমর নিমরাজী হয়েও রাজী হয়ে গেল। পরদিন সন্ধ্যেবেলা রিহার্সাল। সবাই বসে আছে। দৃষ্টি তাদের টেবিলে রাখা ভুডু ডলের দিকে। পুতুল যে এত বীভৎস আর জীবন্ত হতে পারে এ ধারণা কারো ছিল না এর আগে। ইন্দ্রনীল বলল—এস সব, শুরু করা যাক।

ওরা প্রস্তুত হচ্ছে ঠিক সেই সময় আলো নিভে গেল। লোডশেডিং। ইন্দ্রনীল চেঁচিয়ে উঠল—তাকের ওপর মোমবাতি আছে, জ্বেলে দে তো কেউ।

মানিক চেঁচিয়ে বলল—যে যেখানে আছ, থাক, আমি জ্বালাচ্ছি দাঁড়াও।

রজত পকেট থেকে টর্চ বার করে তাকের ওপর ফেলে বলল—আমি বাপু সাবধানী। সব সময় পকেটে টর্চ নিয়ে ঘুরি। কলকাতা নয় যেন গ্রাম! আলো আছে আবার নেইও।

কিন্তু এ কি! রজতের টর্চটা একবার জ্বলেই নিভে গেল। অবাক হয়ে গেল রজত। মাত্র কালকেই সে ব্যাটারি লাগিয়েছে। ব্যাটারির

কথা তার মাথায় নেই—তার মনে একটা দারুণ ধাক্কা লেগেছে। টর্চটা জ্বালতে গিয়ে টেবিলে রাখা ভুডুর গায়ে পড়েছিল—এক মুহূর্তের জন্যে তারই মধ্যে সে দেখল—ভুডু ডল যেন হাসছে। সে কি বীভৎস হাসি! রজত চুপ করে রইল। কারোকে কিছু বলল না।

মানিক চেঁচিয়ে উঠল—দেশলাই—একটা দেশলাই দেখা রে। অমর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেশলাই বার করতে গেল। কে যেন তার হাত দুটো চেপে ধরেছে। পারল না। বিরক্ত হয়ে বলল—কে রে? হাতটা ছাড়। এখন ইয়ার্কি মারার সময়? এ নিশ্চয় রজত, আমার হাত ধরেছে।

রজত চেঁচিয়ে উঠল—এই খবরদার আমার নামে দোষ দেবে না। আমি তো তাকের কাছে।

মানিক ধমক দিয়ে বলে—একটা দেশলাই নেই কারো কাছে? অথচ রাতদিন সব ফুঁকছে।

জগু চেঁচিয়ে বলে—ঠিক আছে—আমি বাইরে থেকে আলো জ্বেলে নিয়ে আসছি দাঁড়াও। ঠিক এই সময় দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। রজতের টর্চটাও জ্বলে উঠল। অমরের হাতটাও কে যেন ছেড়ে দিল।

আরম্ভেই এই ধাক্কাটা সকলে সহজে নিতে পারল না। রাতও হয়েছে—ঠিক হলো পরদিন থেকে রিহার্সাল শুরু হবে। আর রজতের ওপর ভার পড়ল একটা এমারজেন্সি আলোর ব্যবস্থা করার। যাতে লোডশেডিং হলেও রিহার্সালের কোনো ক্ষতি হবে না। তবে অন্ধকারে পুতুলটাকে ভাল করে দেখা যায়নি—সুতরাং বন্ধুরা ধরে বসল অমরকে—আর একদিনের জন্যে পুতুল নিয়ে আসতে হবে।

পরদিন রিহার্সালে আবার লোডশেডিং হলো—আবার সেই ঘটনা ঘটল কিন্তু এমারজেন্সি লাইটটা জ্বলল না।

সকলে হঠাৎ চমকে উঠল। টেবিলে যেখানে ভুডুকে বসানো হয়েছে—সেখান থেকে দুটো তীব্র নীল আলোর গোলা বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে চারদিকে আলো ছড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন নীল আলোয় মৃত্যুর হাতছানি! সে রাতেও রিহার্সাল হলো না। ঠিক হলো পরদিন আবার রিহার্সাল হবে।

অমর বলল—এই পুতুলটা অশুভ শক্তি। কাল আর একে আনছি না।

ইন্দ্রনীল বলল—না অমর, আমি ওসব শুভ-অশুভ শক্তিতে বিশ্বাস

করি না। তুই কাল আর একবার কষ্ট করে আনিস—তারপর আর বলবো না।

মানিকের শোবার ঘরের চেয়ারে দেখা গেল একটা ভুড়ু ডল। মানিক সেদিকে তাকিয়ে বলল—ক্ষমা করো ভুড়ু ডল। এই লোভটা কিছুতেই সামলাতে পারলুম না। নকল পুতুলটার সঙ্গে তোমাকে বদলে নিয়েছি। অন্ধকার হতেই কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে নকল বেরিয়ে এসে আসলের জায়গা নিলো। আসলে কাহিনীটা তোমার সত্যি কিনা আমি নিজে পরীক্ষা করব। সব বুজরুকি ঘুচিয়ে আমি প্রমাণ করবো অমর মিথ্যে কথা বলেছে। প্রমাণ করে দেবো বিংশ শতাব্দীর মানুষ ভুড়ুতে বিশ্বাস করে না। তারপর যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দেবো।

মানিকের ঘরে সে রাতে কিন্তু নতুন কিছু ঘটল না। পরদিন পুতুলটাকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল তাকে। সবাই অবাক হয়ে গেল। নকল পুতুল বলে ওরা বুঝতেই পারল না। ঠিক সেই সময় অমর এলো মানিকের বদলে নেওয়া পুতুল নিয়ে। তাকে রাখতে গিয়ে চমকে উঠল। কোনটা আসল কোনটা নকল বোঝা যায় না। অমর বলল—এ পুতুল তুই পেলি কি করে?

হাসল মানিক। বলল—তোরা তো জানিস আমি ছবি আঁকি। পুতুলটাকে দেখে আমি একটা স্কেচ করে নিয়েছিলুম। আমার খুড়তুতো বোনের পুতুল তৈরির কারখানা আছে। সেখানে স্কেচ ফেলে দিতেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেয়ে গেলুম।

সকলে খুব তারিফ করতে লাগল। কিন্তু অমর কেন জানি না গম্ভীর হয়ে গেল।

অমরের মুখ দেখে মানিকের হাসি পেলেও হাসতে পারল না। একটা ব্যাপার কাল থেকে তার মনে কাঁটার মতো বিঁধে রয়েছে। গতকাল লোডশেডিং হবার সঙ্গে সঙ্গে সে আসল পুতুলটা ব্যাগে পুরে ফেলেছিল। কিন্তু অবাক কাণ্ড—আলো নেভার সঙ্গে সঙ্গে নকল পুতুলের চোখে একটা নীল আলো দেখা দিয়েছিল। এটা কি করে সম্ভব হলো? তবে কি তার মতো কোনো ছেলে ভয় দেখাবার জন্যে কোনো কায়দা করে আলোর আভা সৃষ্টি করেছিল! মানিক ভাববার সময় পেলো না—রিহার্সাল শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু এ কি ঠিক রাত সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্ধকার নেমে এলো। রজত মোমবাতি জ্বালতে

পারল না কিছুতেই। রজত চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিল—কে আমায় ধরেছে? তার আগেই একটা ঘটনা ঘরের সবাইকে স্তব্ধ করে দিল।

টর্চের আলোর মতো কিছুটা নীলচে আলো বেরিয়ে আসছে দুটো পুতুলের দু'জোড়া চোখ থেকে। তারপর সেই চারটে আলো সারা ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগল। ইন্দ্রনীল ছুটে গিয়ে এমারজেন্সি আলোটা জ্বালতে গেল, একটা কিছু এসে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। চিৎকার করে উঠল ইন্দ্রনীল। আলো জ্বলে উঠল। আলো আসার পরও কারও মুখে কোনো কথা শোনা গেল না। সকলে বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল মূর্তিটার দিকে। মানিক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে—সবাই ভয় পাচ্ছ বলে নানারকম ঘটছে। আমি বলছি এসব মিথ্যে। এসব গল্প—কিংবদন্তী।

সবাই চুপ করে থাকে। উত্তেজিত মানিক আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বলে—ওঃ বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে, তাহলে দেখ—এখুনি প্রমাণ করে দেবো আমিই ঠিক।

এই বলে মানিক নিজের মাথা থেকে দুটো চুল ছিঁড়ে পুতুল দুটোর হাতে বেঁধে দিল। তারপর ইন্দ্রনীলের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি এটা নিয়ে যাও। এবার কিছু একটা কর ওর ওপর—তারপর বোঝা যাবে কাহিনী কতটা সত্যি।

অমর এক ঝটকায় পুতুলটা সরিয়ে দিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে—খুলে দাও বলছি। আমি এসব কিছুতেই সহ্য করবো না। আমি আমার কাকার কথা বিশ্বাস করি। কাকা কোনোদিন আমাকে মিথ্যে বলেননি। মানিক তুমি খুলে নাও বলছি—নয়তো আমি খুলে দেবো।

ইন্দ্রনীল ধমক দিল—এই মানিক—এসব কি হচ্ছে? এসব ব্ল্যাক ম্যাজিক বুঝলি?

মানিক এবার রীতিমতো ক্ষেপে উঠল। বলল—ওঃ তাহলে দেখছি তুমিও বিশ্বাস কর এসব বুজরুকি? ঠিক আছে—যত কাপুরুষের দল—চেয়ে দেখো এবার আমি কি করি। ব্ল্যাক ম্যাজিক কেমন হোয়াইট হয়ে যায় দেখো।

নিমেষের মধ্যে মানিক টেবিল থেকে একটা আলপিন নিয়ে ফুটিয়ে দিল পুতুলটার পায়ে। নিমেষের মধ্যে মানিকের পা থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এলো। চমকে উঠল মানিক। আর একটা আলপিন নিয়ে এগিয়ে চলল নকল পুতুলের দিকে। চিৎকার করে উঠল অমর—বন্ধ

কর, বন্ধ কর এসব খেলা। এমন জানলে এই পুতুল আমি তোমাদের কাছে নিয়ে আসতুম না। মানিকের আলপিন ধরা হাতটা ততক্ষণে নকল পুতুলের কপালের কাছে পৌঁছে গেছে। ফোটাতে গিয়েও পারল না মানিক—ততক্ষণে রজত দৌড়ে এসে ওকে জাপটে ধরেছে।

দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয় কিছুক্ষণ। রজত চিৎকার করে ওঠে—মানিক—মানিক কি করছিস তুই?

কথা বলতে গিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল রজত। সঙ্গে সঙ্গে মানিক ঝাঁপিয়ে পড়ে পুতুলটার ওপর—আলপিনটা ফুটে যায় পুতুলের বাঁ হাতে। মানিক তার বাঁ হাতে পিন ফোটানোর ব্যথা অনুভব করল। আশ্চর্য! নকল আর আসল হঠাৎ এক হয়ে গেল কি করে? মানিক তাকাল বিস্মিত নকল পুতুলটার দিকে। এ কি! পরিষ্কার দেখছে সে পুতুলটার চোখের পাতা পড়ছে। নজর পড়ল পুতুলটার পায়ের দিকে। আবার ভীষণভাবে চমকে উঠল মানিক—পুতুলটার পায়েও রক্তের ফোঁটা জমে রয়েছে। এ কি করে সম্ভব!

অমর ছুটে এসে দুটো পুতুলই তুলে নিল। বলল—ঢের হয়েছে আর না। এ দুটোই আমি নিয়ে যাচ্ছি। মানিককে বিশ্বাস নেই। পরে কাকার সঙ্গে কথা বলে এ দুটোকেই বিদায় করব। এমন সাংঘাতিক জিনিস আমার দরকার নেই।

রজত, ইন্দ্রনীল দুজনেই বলে ওঠে—না না অমর, তুমি আর এনো না ও দুটোকে। মানিক যা ছেলে—এরপর বড় কিছু না ঘটিয়ে ফেলে। আর শোন—বাড়িতে গিয়ে পুতুলের হাত থেকে মানিকের চুলটুল যা লেগে আছে সব ফেলে দিও—বুঝলে?

অমর জোর দিয়ে বলল—সে আর বলতে?

পরপর ঘটনায় অমর ক্লান্তি অনুভব করছিল। ঠিক করল পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই পুতুলের গায়ে লাগানো মানিকের মাথার চুল খুলে নেবে। তারপর কাকার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবে। পুতুলটাকে আর তার ঘরে রাখতে সাহস হয় না। অমর খাওয়া-দাওয়া করে নানা বিষয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল অমরের।

—হ্যাঁরে খোকা! তুই কি বসার ঘরের তাকের ওপর দুটো পুতুল রেখেছিলি?

প্রথমটা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল অমর—ঘুমচোখে তারপর

মনে পড়ল কাল রাতে ও তাকের উপর উঁচুতে পুতুল দুটো তুলে রেখেছিল। হঠাৎ এক অজানা আশঙ্কায় ওর বুকের মধ্যেটা কেঁপে উঠলো। উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠল—কেন মা? কি হয়েছে?

মা বললেন—দেখ না, ইঁদুরে ঘরময় কি কাণ্ড করেছে। এত ইঁদুর হয়েছে, জ্বালিয়ে খেলো বাপু, এত করে বলি একটা ব্যবস্থা কর, তা না...

মার কথা অমরের কানেই যাচ্ছে না। সে পাগলের মতো ছুটে গেল বসার ঘরের দিকে। তাকের ওপর থেকে দুটো পুতুলই নিচে পড়েছে। তার মধ্যে একটির জামাকাপড় সব কুচিকুচি কেটেছে ইঁদুরে। অন্যটি প্রায় অক্ষত। কিন্তু তাহলেও একেবারে অক্ষত নয়। অমরের কান-মাথা ভোঁ ভোঁ করছে—বুক নামাওঠা করছে হাপরের মতো। মনে মনে ভগবানকে ডাকছে অমর—হে ভগবান—এটা যেন সেটাই না হয়।

ছুটে গেল অমর পুতুল দুটোর কাছে। দুটো পুতুলই চোখের কাছে এনে পরীক্ষা করল অত্যন্ত সন্তর্পণে। তারপরই ভয়ে তার মুখটা সাদা হয়ে গেল। মানিকের মাথার চুল আটকানো পুতুলটার পায়ের ওপর যেখানে পিন ফোটানো হয়েছিল সেখানে রক্ত শুকিয়ে ছিল। ইঁদুর সেই রক্তের গন্ধে ঐ জায়গাটায় গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। অমর একমুহূর্ত দেরি না করে ইন্দ্রনীলকে ফোন করল। বলল—আমি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, এখুনি মানিকের বাড়ি যেতে হবে। তোমাদের ৪/৫ মিনিটের মধ্যেই তুলে নেবো।

ইন্দ্রনীল বলল—কি ব্যাপার অমর?

অমর বলল—গুরুতর ব্যাপার—পরে বলব, তোমরা তৈরি থেকো, তুমি রজতকে জানিয়ে দাও।

ফোন কেটে দিল অমর। ইন্দ্রনীলের পাশের বাড়িতেই থাকে রজত। ইন্দ্রনীল জানলা দিয়ে রজতকে ডেকে বলল—রজত, অমরের গলা কাঁপছিল। নিশ্চয়ই ঐ পুতুলের ব্যাপার। তা যদি হয় আমাদের কিন্তু এখুনি মানিকের বাড়ি যাওয়া দরকার।

মানিকের বাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার শব্দে ওরা থমকে দাঁড়াল। তবে কি...! ওরা দৌড়ে দোতলায় মানিকের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে ভিড়। মানিকের খাট ঘিরে অনেক লোকজন। ওরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে তিনজনে।

মানিকের দাদা ওদের দেখতে পেয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। বললেন—দেখে যাও তোমরা। ভাইটা আমার কি নৃশংসভাবে নিজেকে শেষ করেছে। দেখে যাও।

ওরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। দেখল—মানিকের প্রাণহীন দেহটা পড়ে আছে খাটের ওপর—সারা বিছানা ভাসছে রক্তে। যে জায়গাটা ইঁদুরে ক্ষত করেছিল—ঠিক সেই জায়গায় গভীর ক্ষত।

মানিকের দাদা বললেন—দেখো কেমন করে কুরে কুরে ভেনটাকে কেটেছে আত্মহত্যা করবে বলে। কিন্তু ওর কি দুঃখ ছিল বল তো? আত্মহত্যা করার মতো কি এমন ঘটেছে—জানো তোমরা?

ওরা মাথা নাড়ল। রজত বলল—কি দিয়ে এমন করে ক্ষত করল ও?

মানিকের দাদা বললেন—আমিও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। কি দিয়ে এমন করল ও? যা দিয়েই করুক না কেন সেটা তো থাকবে? যাবে কোথায়?

অমরের শরীর খারাপ লাগছিল। এই সব কিছুর জন্যে সে দায়ী। সে যদি পুতুলটা সম্বন্ধে কিছু না বলতো—তাহলে তো এমন ঘটনা ঘটতো না। এতবড় একটা অপরাধ সারাজীবন তাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। কাউকে বলতে পারবে না। বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। অথচ নিজেকে সে তো কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না। প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা অনুভব করল বুকে। চোখের সামনে সব যেন আবছা হয়ে আসছে। সেই আলো-আঁধারের ঘোরে অমর পরিষ্কার দেখল—মানিক এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে বলছে—আমার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী? তুমি না আমি?

অমর বিড়বিড় করে বলল—আমি...আমি...আমি। আমায় তুই ক্ষমা কর ভাই।

ধপ্ করে একটা শব্দে ঘরের সবাই তাকাল ওদের দিকে। অমর পড়ে আছে মাটিতে অজ্ঞান—অচৈতন্য।

# শেষ বিচার

বাড়ির সামনের পার্কের বেঞ্চিতে বসে ভাবছে পুলক। তার ভেতর কেমন যেন একটা পরিবর্তন আসছে। পায়ের কাছে বসে থাকা তিন মাসের বাচ্চা কুকুরটার দিকে তাকাল পুলক। তার বড় প্রিয় কুকুর। সাধ করে সে নাম রেখেছে "নাইট"। কালো কুচকুচে রং বলে আদর করে ও এই নাম রেখেছে। আর একজন একে খুব ভালবাসে—সে রাধাদি। তার মায়ের মতো। ছোটবেলা থেকে সে বাবা-মা কাউকে পায়নি। এই রাধাদি তাকে বাপ-মার স্নেহ দিয়েছে। সেও রাধাদি ছাড়া কিছু জানে না। আত্মীয়-স্বজন বলতে তার কেউ নেইও। বাবার সম্পত্তি ছাড়া তার আর কিছু নেই। সম্পত্তি বলতে এই বাড়িটা আর নগদ বেশ কিছু টাকা—যার সুদে তার জীবনটা বেশ কেটে যাচ্ছে।

বেশ কেটে যাচ্ছিল—কিন্তু হঠাৎ কোথায় যেন তাল কাটল। রাধাদি এই কুকুরটা আসার পর থেকে সব ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছে

এই কুকুরটাকে। অন্তত পুলকের তাই ধারণা। দিনের মধ্যে ২০ ঘণ্টা যে মানুষটা 'পুলক' 'পুলক' করতো সে কেন আর করে না? বললে বলে—

—কখন করি বল তো? নাইটের খাবার করা আছে, ওর চুল আঁচড়ানো আছে—একটা কুকুরের পেছনে কত খাটুনি জান? এইখানেই পুলকের আপত্তি। প্রথম প্রথম চুপ করে থাকলেও পুলক বেশ বুঝতে পারছে—তার ভেতরে কোনো একটা রিপু প্রবল হয়ে উঠছে।

পুলক আবার কুকুরটার দিকে তাকাল। কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছে মনিবের পায়ের তলায় অথচ গতকাল রাধাদি না এসে পড়লে সে হয়তো নাইটকে খুন করেই ফেলতো। ঘটনাটা সামান্য।

জমাদার এসেছিল তিনতলার বাথরুম পরিষ্কার করতে। পুলক ছিল একতলায়, নাইটের সঙ্গে খেলছিল। হঠাৎ তার মনে হলো স্নান করার সময় তার ঘড়িটা ভুল করে ফেলে এসেছে বাথরুমে। সুতরাং একছুটে সে ওপরে উঠতে গেল—নাইটও মনিবের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে গেল। ফলে যা হবার তা হলো। নাইটের গায়ে পা লেগে সাংঘাতিক ভাবে পড়ে যাচ্ছিল সে হোঁচট খেয়ে। রাগে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পুলক তাকে তিনতলার বারান্দা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল নিচে—ঠিক সময় রাধাদি দৌড়ে এসে জাপটে ধরেছিল নাইটকে। পুলকের শরীরে তখন হাজার হাতির বল। রাধাকে ঠেলে সরিয়ে দিতেই বুড়িমানুষ রাধা পড়ে গিয়ে কপালে চোট পেল—কিন্তু মরল না। টলতে টলতে গিয়ে পুলকের পাটা জড়িয়ে ধরেই অজ্ঞান হয়ে গেল।

পুলক মায়ের মতো ভালোবাসে রাধাকে। রাধার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হলো, কি হয়েছে তার? সে জীবনে যা করেনি তাই করল? ছি ছি...।

পুলক বুঝতে পারছে—নাইটকে সে হিংসে করছে। রাধাদি তাকে ছাড়া আর কারুকে ভালবাসবে—এ সে ভাবতেও পারে না। কিন্তু তাই ঘটছে। ভেতরে ভেতরে সে যে এতটা হিংসাত্মক হয়ে উঠেছিল নাইটের ওপর তা সে বুঝতেও পারেনি। আজ পারল—আর পারছে বলেই নিজেকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়েছে। রাগলে তার আর জ্ঞান থাকছে না। কেমন যেন একটা হারানোর বেদনা তাকে অস্থির করে তুলছে। আজকাল আর কিছু যেন তার ভালো লাগে না। সবসময় একটা বিরক্তি ভাব..., পুলক তাকাল পায়ের তলায় গুটিয়ে শুয়ে

থাকা সরল নিষ্পাপ নাইটের দিকে। ও বুঝতেও পারল না ওর কি হতে যাচ্ছিল—আর বুঝতে পারে না বলেই আজও ও নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমচ্ছে মনিবের পায়ের তলায়। পুলক তাকাল সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে। ক'মাস আগেও ঐ গাছটা দেখতে তার ভাল লাগত। আজ মনে হলো ঐ ফুলে ফুলে লাল হয়ে যাওয়া গাছটাকে সে উপড়ে ফেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। কেন এমন হচ্ছে! পুলক হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়াতে গেল—পায়ের কাছে বাধা পেল। নাইট! পুলক রেগে গিয়ে এক লাথি মারল নাইটকে। কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে দু'হাত দূরে ছিটকে পড়ল নাইট। সেদিকে ফিরেও তাকাল না পুলক—এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। নাইটও চলল কুঁই কুঁই করে কাঁদতে কাঁদতে পুলকের পেছু পেছু—তবে এবার বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে।

ক্রমশ আরো খারাপের দিকে যেতে লাগল পুলক। সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে রাধাদিও ওকে এড়িয়ে চলছে। এড়িয়ে চলছে নাইটও। আর পুলক সম্পূর্ণ একা থেকে নিজেকে একটা শয়তান তৈরি করতে লাগল।

তারপর একদিন সেই চরম ঘটনাটা ঘটে গেল। সন্ধ্যেবেলা চা-জলখাবার খাওয়া পুলকের অভ্যেস। এই খাবারটা রাধাদি সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়ায়। কিন্তু সেদিন কি হলো রাধাদির কি জানি—খাবার রেখে চলে গেল। খুব ক্ষিদে পেলেও পুলক খেল না। রাধার এই নীরবতা পুলকের অসহ্য লাগল। নাইট রাধার পেছন পেছন এল আবার তার সঙ্গেই ফিরে গেল। যাবার আগে পুলক ডাকল—আয় নাইট, সন্দেশ দেবো।

বরাবর নাইট সন্দেশ খায় পুলকের খাবার থেকে। আজ দূর থেকে একবার লেজ নেড়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। কাছে এল না। আবার ডাকল পুলক—'নাইট'। পুলকের কণ্ঠে প্রচণ্ড রাগ ফুটে উঠল। নাইট বুঝল মনিব রাগ করেছে। তবু কাছে এলো না, দরজার কাছে এসে বসল। পুলকের মাথায় রক্ত উঠে গেল। বলল—নাইট ডাকছি না—এসো—।

নাইট এলো না। তেমনি বসে রইল। আর সহ্য হলো না পুলকের। দৌড়ে গেল নাইটের কাছে। তারপর লোহার মতো শক্ত দুটো হাত দিয়ে ও নাইটের গলা টিপে ধরল। তারপর শূন্যে ঝুলিয়ে রাখল কিছুক্ষণ।

তারপর ছেড়ে দিল। ধপ্ করে একটা শব্দ। রাধা রান্নাঘরে ছিল—কোনো শব্দও পেল না, কিছু জানতেও পারলো না। বাড়ির পেছনে একচিলতে জমি আছে—সেখানে নাইটকে পুঁতে রেখে দিল পুলক।

পুলকের অনুশোচনা হলো না। বরং কেমন একটু শান্তি অনুভব করতে লাগল। কিন্তু অবাক কাণ্ড। কটা দিন কেটে গেল, নাইট মরে গেছে, কিন্তু রাধাদি তো একটা কথাও জিজ্ঞেস করল না নাইটের বিষয়ে! দু'বেলা খাবার সময়ও কি সে খোঁজ করে না!

উত্তরটা পেয়ে গেল পুলক, পরের দিনই। পুলক কানখাড়া করে বসে রইল বাড়িতে। ঠিক বেলা একটা। ঘড়িতে ঢং করে একটা শব্দ হতেই রাধার গলা পাওয়া গেল। রাধা নাইটের থালায় ভাত ঢালছে আর বলছে—আয় বাবা খেয়ে আমায় ছেড়ে দে। পা টিপে টিপে নাইটের ঘরের দিকে মুখ করে লুকিয়ে রইল পুলক। এ সে কি দেখছে! রাধাদির ডাক শুনে লাফাতে লাফাতে আসছে নাইট। খাবার খেল—তারপরই অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না পুলক। বাড়ির পেছনে যেখানে নাইটকে ও নিজে হাতে পুঁতেছিল—গভীর রাতে সে সেখানে গেল একটা কোদাল হাতে নিয়ে। মাটি খুঁড়তেই পাওয়া গেল নাইটের লাশ। আশ্চর্য! চেহারাটা এতটুকু বিকৃত হয়নি। ক'দিনের পর এমন তাজা থাকে কি করে? নাইট যে খেয়েছে তার প্রমাণ ওর মুখের চারদিকে তখনও কিছু খাবার লেগে। এসব দেখছিল অবাক হয়ে পুলক এমন সময় হঠাৎ চোখ খুলল নাইট। সে চোখে আগুনের ফুলকি বেরতে লাগল। পায়ের নখগুলো বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। এক লাফ মেরে নিমেষের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল নাইট পুলকের কাঁধে। পুলক কিছু বোঝার আগেই তার ধারালো দাঁত বসিয়ে দিল পুলকের কণ্ঠনালিতে। অনেক ধস্তাধস্তি চেষ্টাতেও ফল হলো না। খানিকক্ষণের মধ্যে পুলকের রক্তহীন মৃতদেহটা গড়িয়ে পড়ল নাইটের জন্যে খোঁড়া গর্তের ভেতর।

# রক্তচোষা

ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে পাথর হয়ে গেল মালিনী। কতই বা বয়স ওর? এই তো তিরিশে পা দিয়েছে, এরই মধ্যে হঠাৎ যেন সে বুড়িয়ে গেছে। সংসারে দাদাই ছিল তার সব। ছোট্ট বয়সে সে বাবা-মাকে হারিয়েছে। তাঁদের কথা তার মনেও নেই। দাদাই তাকে এতদিন আগলে রেখেছিল। কিন্তু কি যে হলো; সেদিন রাত্তিরে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে শুতে গেল দুজনে। মালিনীর ঘর প্রণবেশের ঘরের একটু দূরে। পরদিন ভোরবেলা বীণার চিৎকারে ঘুম ভাঙল মালিনীর। বীণা তাদের কাজের লোক। ভোরবেলা দাদাবাবুকে চা দিতে গিয়ে সে দেখে, ঘরের দরজা খোলা আর দাদাবাবু বিছানায় শুয়ে। তার সমস্ত শরীর রক্তহীন। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ডাক্তার এলো, থানা-পুলিশ হলো, সবশেষে পোস্টমর্টেম। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পড়ে চমকে গেল মালিনী। প্রণবেশের গলার কাছে দুটো দাঁতের দাগ পাওয়া গেছে। কেউ যেন ঐ দুটো ক্ষত দিয়ে শরীরের সমস্ত রক্ত টেনে নিয়েছে।

মালিনীর ধারণা—তাদের বিরাট সম্পত্তির লোভে কেউ দাদাকে হত্যা

করেছে, এবার তার পালা। কেন না তারা দুজন ছাড়া আর তো কেউ নেই এই সম্পত্তি ভোগ করার। ভাইবোনে কেউই বিয়ে করেনি। ঠিক করেছিল তাদের মৃত্যুর পর সব দান করে যাবে ভাল কাজে। কি করেই বা জানবে মালিনী, এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে? ঠিক এই মুহূর্তে তার একজন অভিভাবক থাকলে ভাল হতো।

মনে পড়ল কৌশিকের কথা। দাদা কয়েকমাস আগে একদিন হঠাৎ একটি ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ঢুকল। বলল, দেখ মালিনী, নিচের ঘরটা তো খালি থাকে, একটা লোক থাকলে ভাল হয়। এই ছেলেটির নাম কৌশিক, চন্দননগরে থাকতো, এখানে চাকরি নিয়ে এসেছে। এদিককার কিছুই ওর জানা নেই। তাই বলছি কিছুদিনের জন্যে ও পেয়িং গেস্ট হিসেবে ওই ঘরেই থাকুক। অবশ্য ওকে খেতে দিতে হবে না। ওর চাকরিটা বড় অদ্ভুত। নাইট ডিউটি, সারাদিন ও ঘুমোবে, রাত্তিরে বেরোবে আবার ভোরবেলা ফিরে আসবে। কোনো ঝামেলা নেই।

দাদার কাণ্ড দেখে খুব রাগ হলো মালিনীর। কোথাকার কে তাকে দুম করে বাড়ি এনে তুলল দাদা, এ তো রীতিমতো বাড়াবাড়ি। কৌশিকের সামনে আর কিছু বলল না সে। পরে আড়ালে বলল—জানাশোনা নেই, কেমন লোক জান না, একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলে দাদা? যদি কিছু হয়...

হো হো করে হাসল প্রণবেশ। কি হবে? চুরি, ডাকাতি, মারপিট, দাঙ্গা করবে? আরে বাবা, ছেলেটাকে দেখেই এনেছি আমি। বাঙালী খ্রিশ্চান, বাড়ির সামনে রাস্তায় বসে ছিল, দেখে মায়া হলো বুঝলি। যাকগে, তোর যদি পছন্দ না হয়, চলে যেতেই বলব।

ক্ষুণ্ন হলো মালিনী—বলল—আমি কি তাই বলেছি—দাদা?

সান্ত্বনা দিয়ে বলল প্রণবেশ, আমি জানতুম রে। তুই কখনও আমার কাজের বিরুদ্ধে যাবি না।

এখন মনে হচ্ছে মালিনীর, বিরুদ্ধে গেলেই বোধহয় ভাল ছিল। কেন না কৌশিককে সে কিছুতেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারেনি। কৌশিক হয়তো তারই বয়সী। কিন্তু এমন ধরনের চাকরি সে জীবনে দেখেনি। সারারাত ওর কিসের ডিউটি?

ভাবতে ভাবতে মালিনী দাদার ঘরে ঢুকল। সন্ধ্যা হয় হয়। অল্প পাওয়ারের আলো জ্বেলে ও তাকাল দাদার খাটের ধারে দেওয়ালে

টাঙানো বিরাট আয়নাটার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে খাটটাকে ধরে ফেলল মালিনী। সেই আলো- আঁধারে আয়নার গায়ে ফুটে উঠতে লাগল একটা ছায়া। চট করে মালিনী পেছন ফিরে তাকাল। পেছন থেকে কেউ...না তো! দরজা তো ভেজানো, তবে কার ছায়া পড়ল? আবার সে তাকাল আয়নার দিকে। কেউ কোথাও নেই। তবে কি সে ভুল দেখল? তার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল নাকি!

মালিনী ভাবতে ভাবতে ফিরে এলো ঘরে। বারান্দা দিয়ে একতলার ঘরটা দেখা যায়। নিজের ঘরে ঢোকার মুখে মালিনী একবার তাকাল কৌশিকের ঘরের দিকটায়। এখনও অন্ধকার। আশ্চর্য, ঠিক রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঘরের আলোটা রোজ জ্বলে ওঠে!

পরদিন সন্ধ্যেবেলা মালিনী দাদার কথাই ভাবছিল। ভাবছিল ওর ভবিষ্যতের কথা। ও মনে মনে বলল—হায় ভগবান! একবার যদি জানতে পারতুম কে দাদাকে খুন করেছে তবে হয়তো কিছু করতে পারতুম। নিজেকেও বাঁচাতে পারতুম বোধহয়। ঠিক সেইসময় মালিনীর হঠাৎ মনে হলো আগের দিনে দেখা ছায়ামূর্তির কথা। খুব যেন চেনা গড়নটা। ছায়াটা কার?

ভাববার সঙ্গে সঙ্গে মালিনী দেখল সে চলতে শুরু করেছে। ঘর পেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে ওকে কে যেন টানতে টানতে নিয়ে চলল প্রণবেশের ঘরের দিকে।

ঘরের আলোটা জ্বালাতেই সেটা দপ করে নিভে গেল। লোডশেডিং। সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। বীণার নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকল মালিনী, কারো সাড়া পেল না। কোথায় যে যায় সব—নিজের মনেই গজগজ করতে করতে বেরোতে গেল মালিনী। আশ্চর্য! তার নিজের বাড়ি, অথচ ঘরের দরজা খুঁজে পাচ্ছে না কেন? হাতড়াতে হাতড়াতে ওর হাতে একটা কি নরম মতো লাগল! কে কে করে চিৎকার করে উঠল মালিনী। বরফের মতো ঠাণ্ডা, একটা মানুষের দেহ বলে মনে হলো। মালিনী আবার চিৎকার করে ডাকতে লাগল বীণাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে আলোটা ফের জ্বলে উঠল। মালিনী দেখল কৌশিক দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। চমকে উঠল মালিনী। তুমি...তুমি এখানে?

কৌশিক বিনীত স্বরে বলল, আপনি চিৎকার করছিলেন, ভাবলাম ভয় পেয়েছেন, তাই ছুটে এলুম।

তুমি তো এসময় ঘুমোও। বীণা কোথায়?

আজ আমার ছুটি। আপনার যদি দরকার থাকে আমি থাকতে পারি।

কৌশিকের চোখ দুটো কেমন যেন। মালিনীর ভাল লাগল না। বলল—না তুমি যাও। আমি ঠিক আছি।

কৌশিক চলে যেতে মালিনী ভাবতে লাগল, যদি সত্যিই কৌশিকের গায়ে হাত পড়ে থাকে তবে তার গা এতো ঠাণ্ডা কেন?

কি মনে হতে ঘরের দরজায় খিল তুলে দিল মালিনী, তারপর তাকাল আবার আয়নার দিকে। একটা ভয় মেশানো প্রচণ্ড কৌতূহল তাকে পেয়ে বসল। ঐ ছায়ামূর্তি কার? কেনই বা আয়নায় সে দেখছে ছায়ামূর্তিটা ছুটে আসছে তার দিকে? সে যদি মৃত্যু হয় তবে তার মুখ দেখতে চায় সে? হঠাৎ সে একটা কাণ্ড করল। দাদার আলমারি থেকে ভাগবত গীতা বার করল, চেপে ধরল সেটা বুকের ওপর। তারপর আয়নার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, দাদা, আমি বুঝতে পেরেছি আয়নার মধ্যে যাকে তুমি দেখাতে চাইছ সে আমাকে হত্যা করতে চায়। তোমাকেও সে হত্যা করেছে। আমি তার মুখ দেখতে চাই। তুমি দেখাও। বুকের ওপর গীতা। মালিনীর হঠাৎ আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হলো। গীতা থাকায় কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সে আবার চাপা গলায় বলে ওঠে, দাদা তুমি দেখাও কে তোমাকে হত্যা করেছে।

আয়নায় ছায়ামূর্তিটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে লাগল। মালিনী চিৎকার করে উঠল—কৌশিক!

এ সে কী দেখছে! কী বীভৎস কৌশিকের মুখটা, দু'পাশে দুটো শ্বদন্ত—দু'কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। এ যে রক্তচোষা! কৌশিক তাহলে মানুষ নয়, জীবন্ত প্রেত! যারা শুধু রক্ত খেয়ে বেঁচে থাকে?

কতক্ষণ যে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল মালিনী সে জানে না। জ্ঞান যখন ফিরল তখন গভীর রাত। ভয়ে ও দরজা খুলতে পারল না। ও জানে দিনের আলো নিভে এলেই এরা জীবন্ত হয়ে ওঠে আর দিনের বেলা মরে থাকে। সারারাত সে বসে কাটিয়ে দিল। পরদিন ভোর হতেই সে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল ওর প্রিয় বান্ধবী বিপাশার বাড়ি। বিপাশার বাবা তন্ত্রসাধক। সব শুনে উনি বললেন, কৌশিকের ঘরের দরজা কি খোলা থাকে দিনের বেলা?

ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। বলল মালিনী। খোলে গভীর রাতে।

সেই সময় ওর ঘরে ঢুকে ওর ব্যবহার করা কোনো জিনিস যদি এনে দিতে পার তাহলে আমি ওর হাত থেকে তোমাকে মুক্তি দিতে পারি। কিন্তু মনে রেখো এর জন্যে তোমার প্রাণসংশয় হতে পারে।

মরতে তো বসেছি কাকাবাবু। যদি বাঁচতে পারি সে চেষ্টা তো করতেই হবে। তবে কাজটা খুব শক্ত।

বিপাশার বাবা বললেন, আমি তোমার কাছাকাছিই থাকবো। কোনোরকম বিপদের আভাস পেলে চিৎকার করে উঠবে। ও তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

বাড়ি ফিরে বীণাকে কোথাও খুঁজে পেল না মালিনী। তবে কি শয়তানটা বীণাকেও মেরে ফেলল! সারাদিন এতটুকু অন্নস্পর্শ করতে পারল না মালিনী। আজ সে এর শেষ করতে চায়—তাতে সে বাঁচুক বা মরুক।

সমস্তক্ষণ খেয়াল রাখছিল মালিনী। ঠিক বারোটা নাগাদ কৌশিকের ঘরে আলো জ্বলতেই, পা টিপে টিপে নেমে এলো মালিনী। বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা। তবু নিজেকে শক্ত করল মালিনী। বুকে তার গীতা। তার ভয় কী!

ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক ছিল। তার ভেতর দিয়ে মালিনী পরিষ্কার দেখল একটা দেহ দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে পড়ে আছে আধশোয়া হয়ে। মুখটা একটু ঘোরানো। ঠিক বুঝতে পারল না ওটা কে, তবে চেহারা দেখে মনে হলো বীণা। ঠিক সেই মুহূর্তে কৌশিক পাশের ঘরে ঢুকল। টেবিলের ওপর শার্টটা খুলে রেখেছিল, ঐ শার্টটাই হাতাতে হবে মালিনীকে। কৌশিক পাশের ঘরে, যে কোনো মুহূর্তে এসে পড়বে, টেবিলের কাছেই মৃতদেহটা। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে মালিনী। কিন্তু উপায় নেই, এ তার জীবনমৃত্যুর সংগ্রাম। মুহূর্ত দেরি না করে পা টিপে টিপে টেবিলের কাছে গেল মালিনী। চট করে শার্টটা টেনে নিল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল আধশোয়া মৃতদেহের দিকে। অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে। বীণা মৃত, কিন্তু জীবন্ত। ওর দুটো শ্বদন্ত রক্তমাখা। চোখ দুটো ঘুরছে। মালিনীকে দেখে উঠে বসল বীণা। দু'হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে গেল ওর শাড়ির আঁচল। ছিটকে ঘর থেকে পালিয়ে এলো মালিনী। দেখল কৌশিক দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। এক মুহূর্ত দেরি না করে মালিনী ছুটতে লাগল বাড়ির দরজা খুলে রাস্তা দিয়ে। কাছেই ছিলেন বিপাশার বাবা, চট করে ওকে গাড়িতে তুলে নিলেন।

বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরের সামনে গাড়িটা রাখলেন বিপাশার বাবা। তাঁর পরনে ছিল লাল চেলি, কপালে সিঁদুরের তিলক, গলায় রুদ্রাক্ষ। মালিনীকে বললেন, এসো, তাড়াতাড়ি।

মালিনীকে নিয়ে উনি ঢুকলেন মন্দিরের ভেতর। মালিনী দেখল মা কালীর মূর্তি, তার সামনে পুজোর আসন—উপচার সব আছে। পাশে একটা মাটির পুতুল রাখা, পুতুলটা প্রায় এক হাত লম্বা। বিপাশার বাবা মালিনীর হাত থেকে কৌশিকের ব্যবহৃত শার্টটা নিয়ে তাড়াতাড়ি পুতুলটার গায়ে পরিয়ে দিলেন। তারপর আসনে বসে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। মালিনী এখনও কাঁপছে। কৌশিক বীণাকে মেরে তাকে পিশাচ তৈরি করে রেখেছে। মালিনী পরিষ্কার দেখেছে বীণার দু'দিকের দুটো দাঁত তীক্ষ্ণ হয়ে বেরিয়ে আছে। তার দাদার গলাতেও এমনি দুটো দাঁতের ক্ষত পাওয়া গিয়েছিল। কেউ তার রক্ত শুষে নিয়েছিল। তাহলে তো মালিনীরও ওই পরিণতি হতো। ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল মালিনী। আর সেই মুহূর্তে ও যা দেখল, তা বুকফাটা আর্তনাদ হয়ে বেরিয়ে এলো কণ্ঠ দিয়ে—কাকাবাবু, কৌশিক!

মালিনীর চিৎকার শুনে বিপাশার বাবা তাকিয়ে দেখলেন, যেখানে তাঁর গাড়িটা রেখেছিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে কৌশিক আর বীণা। মালিনীর চিৎকারে ঘুরে দাঁড়াল ওরা। ওদের মুখে ফুটে উঠল বীভৎস এক হাসি। মালিনীর চোখের সামনে সব ঘুরতে লাগল। বুঝিবা অজ্ঞান হয়ে যায়। ওরা এগিয়ে আসছে মন্দিরের দিকে। আসছে বললে ভুল হবে, যেন উড়ে আসছে। প্রায় মন্দিরের চাতাল ছুঁই ছুঁই ঠিক তখুনি বিপাশার বাবা, মায়ের হাতের খাঁড়াটা খুলে নিয়ে পুতুলটার গলায় মারলেন এক কোপ। পুতুলের ধড় থেকে গলাটা আলাদা হয়ে মায়ের পায়ের কাছে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কৌশিকের ধড় থেকে গলাটা কেটে পড়ে গেল মাটিতে। কৌশিকের শক্তিতেই বীণা চালিত ছিল বলে সেই মুহূর্তে বীণার প্রাণহীন শরীরটাও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বিপাশার বাবা মন্ত্রপূত পুতুলটাকে তুলে নিয়ে মালিনীর হাত ধরে বেরিয়ে এলেন মন্দির থেকে। তারপর খানিক দূরে একটা ডোবার মধ্যে ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে চললেন বাড়ির দিকে।

# রেফ্রিজারেটর

মণি সান্যালের জীবনে এ এক অদ্ভুত ঘটনা। সামান্য মাইনের চাকরি করে শুধু দিন আনা দিন খাওয়া ছাড়া আর কোনো শখ-সাধ মেটানোর কোনো সুযোগই আসেনি তাঁর জীবনে। হঠাৎ সেই সুযোগ তিনি পেয়ে গেলেন। খুব আনন্দ করে একদিন তিনি একটা ফ্রিজ কিনে ফেললেন। বাড়ির লোক তো অবাক। সামান্য রোজগারে ফ্রিজ! নিশ্চয়ই তিনি কোনো ধারদেনা করেছেন। মণি সান্যালের মুখে তৃপ্তির হাসি। বললেন—ধারদেনা করে শখ মেটানোর বান্দা আমি নই।

—তবে?

—পেয়ে গেলাম। প্রায় নিঃখরচায় বলতে গেলে।

—নিঃখরচায়? কি রকম? সকলের কৌতূহলের আর শেষ নেই।

—আমার এক বন্ধু, জাহাজে চাকরি করত। বন্ধুটি কিন্তু হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিল। কি যেন সব গণ্ডগোল হয়েছিল। সে যাক একটা

উপকার সে আমার করেছে—মাত্র ৫০০ টাকায় এতবড় একটা ফ্রিজ আমাকে পাইয়ে দিয়েছে। বলল—জাহাজে ছিল, ওরা নতুন কিনবে, বিক্রি করার সময় নেই, তাই যাহোক দামে ছেড়ে দিচ্ছিল।

—এত বড় ফ্রিজ ৫০০ টাকা? সেকেন্ড হ্যান্ড হলেও এর দাম তো কম করে ৫ হাজার। ভারি আশ্চর্য তো!

—আশ্চর্য তো আমিও কম হইনি। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব—এমন বোকা আমি নই।

কিন্তু মণি সান্যাল নিজেকে যতটা ভাগ্যবান মনে করলেন—ততোটা কিন্তু মোটেই নয়। ফ্রিজ আসার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিজ নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল বাড়ির লোকের মধ্যে। বিশেষ করে যখন ফ্রিজটা ঠাণ্ডা হলো—ঠাণ্ডা জল খেল বাড়ির লোক—তখন সে কি আনন্দ সবার মুখে। মণি সান্যাল সব দেখতে লাগলেন আর মনে মনে তৃপ্তি পেতে লাগলেন। এমন করে তো কোনোদিন তিনি ওদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেননি। নিজে একবারও ফ্রিজে হাত দিলেন না। তাঁর মনে হলো—নিজে মাথা ঘামানোর চেয়ে এই দৃশ্য বসে বসে দেখাই বরং অনেক বেশি সুখদায়ক। এই করে কেটে গেল সাতটা দিন। সাত দিনের দিন রাত্তিরে সেই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটে গেল।

সেদিন বাড়িসুদ্ধ সব নেমন্তন্ন। মণিবাবুরও নেমন্তন্ন—কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পেটের গণ্ডগোলে প্রায় শয্যাশায়ী। মণি সান্যালের গৃহিণী, ছেলেপুলেদের নিয়ে নেমন্তন্ন যাবার জন্যে কিন্তু তৈরি। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন—ফ্রিজের মধ্যে খাবার আছে। খেয়ে নিও মনে করে। একটু গরম করে নিতেও পার। আমরা চললাম।

মণি সান্যাল হ্যাঁ, না কিছুই বললেন না। ভাবলেন—এই হচ্ছে জগৎ! কত স্বার্থপর দুনিয়ার মানুষ। তাদের জন্যেই ফ্রিজ আনলুম, তাদের দেখেই আমার আনন্দ। অথচ কেউ তো একবার আমার কথা চিন্তাও করল না। ভাবলেন—এই জন্যেই বুঝি দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হতে পেরেছিলেন। যাই হোক, রাত তখন ন'টা হবে। মণি সান্যাল ফ্রিজ খুললেন খাবার বার করার জন্যে। আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠেই সশব্দে ফ্রিজের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। বাড়িতে কেউ নেই—কি করবেন তিনি? কি করা উচিত এখন তাঁর? এ কেমন করে সম্ভব হলো? কে করল...ভাবতে ভাবতে মাথা খারাপ হয়ে যাবার দাখিল। উনি কোনো উপায় না দেখে থানায় ফোন করলেন। ফোন বাজল। ওপার থেকে কেউ বলে উঠল—হ্যালো—

মণি সান্যাল কান পেতে শুনলেন—কথা বলতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ভয়ে তাঁর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কথা বলার শক্তি তাঁর নেই। তিনি ভাবলেন হয়তো তিনি চোখে ভুল দেখেছেন—মৃতদেহ! মৃতদেহটা একটা অল্পবয়সী সুন্দরী যুবতীর। দেখে বাঙালী বলে মনে হলো না। মণি সান্যাল হঠাৎ খুব শক্ত হয়ে গেলেন। চোখের বিবাদ ভঞ্জন করার উদ্দেশ্যে ফের ফ্রিজটা খুললেন। নাঃ ভুল তাঁর হয়নি। এই তো পরিষ্কার তিনি দেখতে পাচ্ছেন মৃতদেহটাকে রাখা হয়েছে ভেতরে! আবার সশব্দে ফ্রিজ তিনি বন্ধ করে দিলেন। তারপর উত্তেজনা কমতে একতলায় বসবার ঘরে গিয়ে বসে রইলেন। খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলেই গেলেন তিনি। এক এক মিনিট অফুরন্ত প্রতীক্ষা যেন ফুরতে চায় না। অবশেষে সবাই ফিরল। অবাক হয়ে গেল সব মণিবাবুর উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা দেখে। ছুটে এল ওরা, কি হয়েছে?

কোনো কথা বললেন না মণিবাবু। খুব আস্তে আস্তে বললেন—ফ্রিজ খোল।

ফ্রিজ খোলা হলো। দরজাটা খুলে রেখেই গিন্নী বললেন—খুলেছি, এবার কি করব বল। যতসব ভীতুর ডিম আমার কপালে জোটে গা!

মণিবাবু গিন্নীর দিকে তাকিয়ে বললেন—নেই?

গিন্নী এতবড় হাঁ করে বললেন—ওমা একি গো! অ্যাঁ! কি থাকবে?

মণিবাবু বললেন—কোনো মেয়ের মৃতদেহ?

—ছ্যা ছ্যা ছ্যা ছ্যা। এ তুমি কি বলছো গো অ্যাঁ? ফ্রিজের মধ্যে মড়া থাকবে? তাও মানুষের?

অন্যমনস্ক হয়ে যেন বললেন মণিবাবু, আমি কিন্তু নিজে চোখে দেখেছিলাম।

গিন্নী ফ্রিজের দরজা খুলে বললেন—আবার দেখো। দেখো তুমি কি দেখতে কি দেখেছো! ভাল করে চেয়ে দেখো, আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

খুব সাহস করে ফ্রিজের ভেতর একবার উঁকি মেরেই পালিয়ে গেলেন মণিবাবু।—ঐ তো—ঐ তো আছে।

—না—নেই—জোর গলায় বললেন মণিবাবুর গৃহিণী।

আশ্চর্য একমাত্র মণিবাবু ছাড়া আর কেউ মৃতদেহটা দেখতে পাচ্ছে না। সকলে দেখছে স্বাভাবিক। মণি সান্যাল একমাত্র মানুষ, যিনি দেখছেন ফ্রিজের মধ্যে একটা মৃতদেহকে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে।

দু'চার দিনের জন্যে অফিসের কাজ বন্ধ করলেন ডাক্তারবাবু। তাঁর বক্তব্য অধিক পরিশ্রমের ফলে এসব ইলিউসান দেখা যেতে পারে।

মণিবাবু কিন্তু শুনলেন না কারো কথা—সোজা অফিসে চলে গেলেন। ঐ বাড়ি থেকে তাঁকে পালিয়ে আসতে হবে। ওখানে থাকলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। কিন্তু এও বা কি করে সম্ভব হচ্ছে! তিনি একমাত্র দেখতে পাচ্ছেন, আর কেউ দেখতে পাচ্ছে না...আচ্ছা ভুতুড়ে কাণ্ড তো! ভুতুড়ে কথাটা মনে আসতেই হঠাৎ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। অফিস ছুটি হতেই তিনি সোজা চলে গেলেন বন্ধুর বাড়ি। যে বন্ধু তাঁকে ফ্রিজ কিনিয়ে দিয়েছেন।

গিয়ে দেখা পেলেন না। বসতে হলো প্রায় ঘণ্টাখানেক। তারপর দেখা হলো বন্ধু চঞ্চলের সঙ্গে। চঞ্চলবাবু একটু বেরিয়েছিলেন, ফিরে এসে বন্ধুকে দেখে অবাক। বললেন—কি রে কি ব্যাপার?

মণিবাবু কিন্তু হাসলেন না। গম্ভীর হয়ে বললেন—তুই আমার অনেক দিনের বন্ধু চঞ্চল। এতবড় সর্বনাশ আমার কেন করলি?

—সর্বনাশ! মণি কি বলছিস! আমি তোর সর্বনাশ করেছি!

—হ্যাঁ করেছিস। তুই একটা ভুতুড়ে ফ্রিজ আমাকে গছিয়েছিস। জেনেশুনে এতবড় সর্বনাশ কেন করলি?

—ভুতুড়ে ফ্রিজ! হা হা করে হেসে উঠলেন চঞ্চল। বললেন—হাসালি ভাই, ভুতুড়ে ফ্রিজের নামও আমি কিন্তু কোনোদিন শুনিনি।

—হাসিস নি—চঞ্চল। আমার কথার উত্তর দে। সত্যি বলবি। মনে রাখিস ছোটবেলার বন্ধু আমরা। বল, তোদের জাহাজে কোনো যুবতী মেয়ে ছিল!

—ছিল বৈকি। মেয়েটির নাম এমিলি।

—ফরসা, মাথায় খয়েরি চুল...

চমকে উঠলেন চঞ্চল—তুই...তুই...কি করে জানলি?

—বল এবার মেয়েটিকে কি মরতে হয়েছে!

—তুই-তুই...তোকে এসব কে বলেছে!

—বল চঞ্চল—তোর কথার ওপর আমার জীবন নির্ভর করছে। তুই বল চঞ্চল, লুকোসনি।

—হ্যাঁ, মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল।

—তারপর তার মৃতদেহটা তোরা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিলি তাই না!

—মণি, এসব কথা কেউ জানে না আজ অব্দি। তুই কি করে জানলি বল।

—তার আগে তুই বল—এজন্যেই কি তুই চাকরি ছেড়েছিস—এইজন্যেই কি এত সস্তায় তুই আমাকে কিনিয়ে দিয়েছিস? উত্তর দে...উত্তর দে...

—হ্যাঁ...। কিন্তু বিশ্বাস কর, ফ্রিজটা কোনোরকম ভাবেই ভুতুড়ে বলে আমরা কেউ জানতাম না। এই প্রথম শুনছি।

—সব কিছু তুই আমায় খুলে বল চঞ্চল—আমি জানতে চাই, কেন এমিলির আত্মা আমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। বল তুই, বল।

—তবে শোন। এমিলি একটা খ্রিস্টান মেয়ে—খুব গরীব, আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন ওকে দয়া করে কাজ দিয়েছিলেন, কিন্তু এমিলির স্বভাব ছিল চুরি করা। অভাবে ওর স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। প্রায়ই আমাদের টাকাপয়সা চুরি যেতে লাগল। এ নিয়ে এমিলিকে অনেক বকাঝকা করা হয়েছিল কিন্তু কাজ হয়নি। একদিন ও খোদ ক্যাপ্টেনের সিন্দুক খুলতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল, ক্যাপ্টেন আর রাগ সামলাতে পারলেন না—প্রচণ্ড মারধোর করলেন। এমিলি সে আঘাত সহ্য করতে পারল না। সে রাতেই মারা গেল। ব্যাপারটা পুরো লুকনোর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কেননা তখন জাহাজ বন্দরে এসে গেছে। এমিলির দেহটা ফেলা নিয়ে সমস্যা দেখা গেল। পুলিশ জানতে পারলে দারুণ ঝামেলা। হয়তো ক্যাপ্টেনের ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। মাঝ সমুদ্রে হলে জলে ফেলে দিলে কেউ টের পেত না। কিন্তু বন্দরে এটা সম্ভব নয়। অথচ ৫/৬ দিনের আগে জাহাজ ছাড়বেও না। এই ৫/৬ দিন ওর দেহটাকে কোথায় রাখা যায়? যেখানে রাখবে পচে গন্ধ বেরবে। এজন্যে শেষ পর্যন্ত ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপর—জাহাজ ছাড়বার পর ক'দিন বাদে ওকে মাঝ সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়।

—কিন্তু তুমি কেন চাকরি ছাড়লে? এমিলির প্রেতাত্মা কি তোমাকেও দেখা দিত?

—না, তা কোনো দিন হয়নি—তবে...

—তবে? তবে কি?

—এরপর থেকে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। ঐ ফ্রিজের ভেতর আর কোনো খাবারদাবার রাখা যাচ্ছিল না। যা রাখা হচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে তা পচে যাচ্ছিল। আমরা মনে করেছিলাম ফ্রিজটা খারাপ

হয়ে গেছে। অনেকবার সারানো হলো—কোনো ফল হলো না। তখন ক্যাপ্টেন বললেন ঐ ফ্রিজটা বিক্রি করার জন্যে। না বিক্রি হলে ওটা আমাদের ফেলেই দিতে হবে।

—কিন্তু তুমি কেন চাকরি ছাড়লে বললে না?

—বলছি। এমিলি যাবার পর একমাস ধরে আমি কিছু খেতে পারতুম না। যে খাবারই খেতে যেতুম, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত এমিলিকে তাল তুবড়ে কি ভাবে ফ্রিজে ঢোকানো হয়েছিল। সেই দৃশ্যটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না। এর ঠিক এক মাস পরে ক্যাপ্টেন হঠাৎ মারা গেলেন। একদিন সকালে উঠে সবাই দেখল ডেকের ওপর ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ। চোখ দুটো স্থির, মনে হয় যেন কাউকে দেখে ভয় পেয়েছিল। দিন চার-পাঁচ পরে আমাদের আর একজন গেল—ঠিক ঐ একভাবে। আমার মনে হলো জাহাজটা অভিশপ্ত হয়ে গেছে। একদিন হয়তো আমাকেও এভাবে মরতে হবে। কলকাতায় জাহাজ নোঙর করতেই সঙ্গে সঙ্গে চাকরিতে ইস্তফা দিলাম। জাহাজে যে ক'জন পুরনো নাবিক ছিলেন তাঁরা ফ্রিজটা ডকে নামিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন—চঞ্চলদা—পারেন তো বিক্রি করে দিন ফ্রিজটা। নয়তো আপনি নিয়ে নিন। এই অভিশপ্ত জাহাজে আমরা পুরনো আর কোনো জিনিস রাখব না, সব নতুন দিয়ে সাজাব। সারা জাহাজ রং করব। তারপর শান্তি-স্বস্তেন করে তবে জাহাজ চালাব।

—এত কাণ্ড জেনেও তুমি আমায় ফ্রিজটা বিক্রি করলে—এ কি রকম বন্ধু তুমি চঞ্চল!

—বিশ্বাস করো আমি বুঝতে পারিনি, ফ্রিজের মধ্যে এমিলির আত্মা ঘুরে বেড়াবে। আমি, আমি অত্যন্ত লজ্জিত মণি। তুমি তোমার টাকা ফেরত নিয়ে যাও।

—না চঞ্চল—তার চেয়ে তুমি ওটা অন্য কাউকে বিক্রির ব্যবস্থা করে দাও। তাতে আমার উপকার হবে।

কিন্তু বাদ সাধল মণি সান্যালের বাড়ির লোকেরা। তাদের বক্তব্য—এ ফ্রিজ তারা কিছুতেই বিক্রি করতে দেবে না। এতদিন পরে তারা যে সুখের মুখ দেখেছে, মণি সান্যালের নাকি কোনো অধিকারই নেই তার থেকে তাদের বঞ্চিত করার।

মণি সান্যাল খুব বিপদে পড়লেন। শেষকালে চঞ্চলের সঙ্গে পরামর্শ করে গেলেন চার্চে। সেখানে ফাদারের সাহায্যে এমিলির আত্মার সদ্‌গতি

কামনা করে—করণীয় যা করার করে মণি সান্যাল বাড়ি এলেন। শুধু একটা কাজ তাঁর বাকি রইল। ফাদারের ইচ্ছে ঐ ফ্রিজটাকে একবার চার্চের দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখা। ফাদার তাতে মন্ত্রপূত জল দিয়ে শুদ্ধ করবেন।

এ ব্যবস্থা করতে অসুবিধে হলো না। কারণ বাড়ির লোক দেখল মণি সান্যাল যখন ওটা বিক্রি করার জন্যে জেদ করছেন না তখন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এটা করা যেতে পারে। বাড়ির লোকের কাছে যদিও এর কোনো গুরুত্বই ছিল না—তবু 'পাগলের কাণ্ড' ভেবে তারা বিরক্ত হলেও বাধা দিল না।

সব কিছু মিটে যাবার পর একদিন আবার ফ্রিজ খুললেন মণি সান্যাল। নাঃ আর এমিলিকে দেখতে পাওয়া গেল না। দারুণ শান্তিতে নিশ্বাস নিলেন তিনি। তবে এরপর কিন্তু কোনোদিন আর তিনি ঐ ফ্রিজ ব্যবহার করেননি।

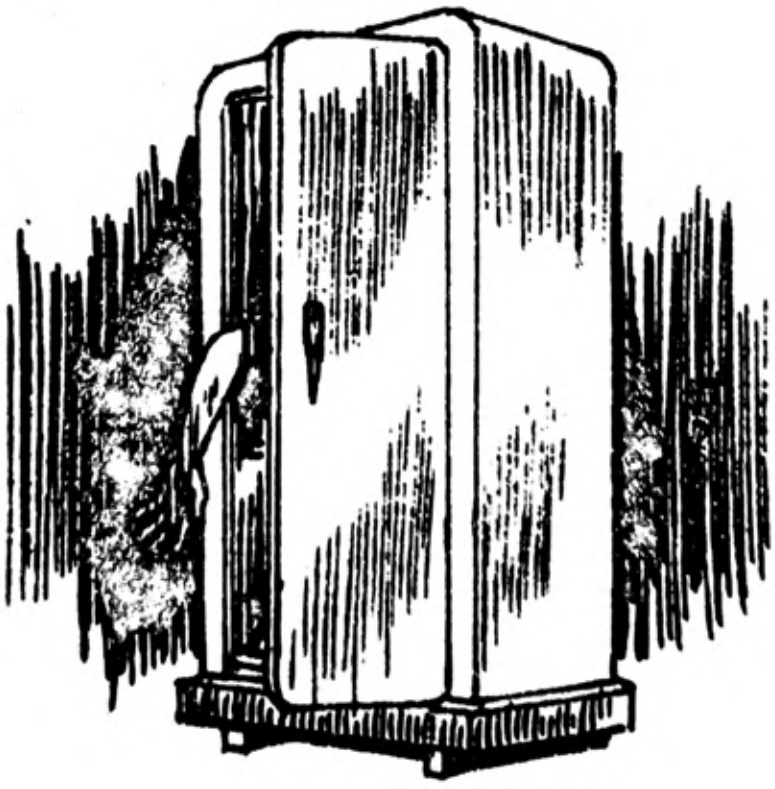

# বটগাছের ডালে

বাড়ি তৈরি করার জন্যে ভিত খুঁড়তে গিয়ে দেখা গেল একটা কবর। কফিনের বাক্সটা খুলতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল। তার ভেতরের মৃতদেহটা তখনও ধুলো হয়ে যায়নি। বরং টাটকাই আছে। অথচ কফিনের বাক্সটা দেখে মনে হলো কবর দেওয়া হয়েছিল অন্তত কয়েকশ' বছর আগে। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করল না কেউ। বেশ খানিকটা দূরে একটা ঝোপের মধ্যে বাক্সটাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল ওরা। আরও একটা সমস্যা দেখা দিল। যেখানে ভিত খোঁড়া হচ্ছিল তার থেকে কুড়ি-পঁচিশ ফুট দূরে একটা বিরাট বটগাছ রয়েছে। এটারও যে কত বয়স কেউ তা জানে না। গুজব আছে ঐ গাছে নাকি ভূত আছে। সন্ধ্যের পর অনেকে দেখেছে গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে কে ঝুলছে—কিন্তু দিনের বেলা আর সে দৃশ্য দেখা যায় না। কবর পাওয়া যেতে স্থানীয় মানুষ এবার দুয়ে দুয়ে চার করল। বলতে লাগল—এই সেই ভূত রাতের বেলা কফিন থেকে বেরিয়ে এসে গাছে ঝোলে—তারপর ভোরবেলা কফিনে ফিরে

যায়। হয়তো বা কোনোদিন লোকটা এই বটগাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়েছিল—তারপর থেকে তার আত্মা মুক্তি পায়নি।

শহরের নামকরা ব্যবসাদার রাধাকান্ত শীল জমি কিনে কন্ট্রাকটারের হাতে বাড়ি তৈরির ভার দিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন। তাই এত ঘটনা তিনি কিছুই জানতে পারলেন না। হয়তো জানতে পারতেনও না যদি না পরপর দুটো এমন সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে না যেত।

বাড়ি তৈরির কাজ প্রায় শেষ। পাহারা দেবার জন্যে একজন দরোয়ানের ব্যবস্থা করা হলো। সেইদিনই রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে টুলে বসে দরোয়ান খৈনি খাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা ছায়ামূর্তি। দরোয়ান দৌড়ে গেল কিন্তু কাউকে খুঁজে পেল না। ফিরে এসে হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরে বসে পড়ল টুলের ওপর। চোখ দুটোও সজাগ রাখল—যদি আবার হঠাৎ দেখা যায় মূর্তিটাকে। পরদিন সকালে দেখা গেল দরোয়ানের মৃতদেহটা ঝুলছে বটের ডালে, গলায় ফাঁস লাগানো।

কি করে যে দরোয়ানের এমন অবস্থা হলো—কেউ তা ভেবে পেলো না। ও যে আত্মহত্যা করেছে এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে? কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হতে না হতে আবার সেই একই ঘটনা ঘটল। এবারও নতুন দরোয়ানকে দেখা গেল ভোরবেলা বটের ডালে ঝুলছে। কে বা কারা ওকে হত্যা করেছে। এরপর থেকে কিন্তু দরোয়ান পাওয়া ভার হয়ে উঠল। কেউ আর ও বাড়িতে রাত কাটাতে চায় না। মিস্ত্রিরা পর্যন্ত বিকেল না হতেই পালায়। শেষে দেখা গেল দিনের বেলাও মিস্ত্রিরা কাজ করতে চাইছে না, বলতে গেলে ক'দিনের মধ্যে বাড়িটা ভুতুড়ে বাড়ি বলে চিহ্নিত হয়ে গেল। আশেপাশের লোকেরা ব্যাপারটাকে আরও ফলাও করে বলতে লাগল। তারা নাকি প্রায়ই দেখে বাড়ির ভেতর কারা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কন্ট্রাকটার মহা বিপদে পড়ল। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল, রাধাকান্ত শীল এলে যাহোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে। রাধাকান্তবাবু ফিরলেন। এসেই সব কথা শুনে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বহু টাকা ব্যয় করে ঐ বাড়ি তিনি তৈরি করিয়েছেন—সে টাকা ওঠাবেন কেমন করে! কয়েকজনের সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন বিক্রি করে দেবেন বলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই পালিয়ে গেল ভয়ে। হঠাৎ রাধাকান্তবাবুর মনে হলো—এই জমিটা তিনি যাঁর কাছ থেকে কিনেছিলেন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে কেমন হয়। যেমন ভাবা তেমন কাজ। সেইদিনই

সন্ধ্যেবেলা রাধাকান্তবাবু হাজির হলেন শশধর ঘোষের বাড়ি। জমিটা শশধর ঘোষের বাবা হরপ্রসাদ ঘোষ কিনেছিলেন ইংরেজ আমলে। বাড়ি তৈরি করবেন বলে জমিটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন—হঠাৎ বুকের যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন—হার্ট অ্যাটাক্। হাসপাতালেও ক'দিন বেঁচে ছিলেন—কিন্তু ঐ ক'দিন খালি ঘোরের মধ্যে বলতেন, "না...না...তুমি শান্তিতে ঘুমচ্ছ—আমি তোমায় বিরক্ত করব না!" কেউ এ কথার মানে বুঝতে পারত না। কে শান্তিতে ঘুমবে! কাকে তিনি বিরক্ত করবেন না বলে কথা দিচ্ছেন—সবটাই তাঁর ছেলেদের কাছে হেঁয়ালি বলে মনে হতো। তার কয়েকদিন পরই হরপ্রসাদ ঘোষ মারা গেলেন। সদ্যকেনা জমিতে বাবার মৃত্যু হয়েছে বলে শশধরবাবুর মনে হলো ঐ জমি হয়তো তাঁদের সইল না। তাই ওই জমি বিক্রি করার জন্যে তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।

রাধাকান্তবাবু বরাবরই খুব সাহসী ছিলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তাঁর জেদ চেপে গেল। তিনি ঠিক করলেন—ওখানে বাড়ি তো করবেনই—তাছাড়া তিনি নিজে একা ও বাড়িতে থেকে দেখবেন কি ব্যাপার। ভাবামাত্র কাজ শুরু হলো। তিনি বাইরে থেকে বেশি টাকা দিয়ে মিস্ত্রি আনিয়ে বাড়ির কাজ শুরু করলেন। দুজন নেপালী বন্দুকধারী দরোয়ান ঠিক করলেন নিচে বসে বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে। গাড়ি গ্যারেজ করে ড্রাইভারও চলে গেল। দুচারটে কাজের লোক ছিল—তারা সব ফিরে গেল। রাধাকান্তবাবু একা একটা রিভলবার নিয়ে শোবার ঘরের বিছানায় এসে বসলেন। চারদিক ভাল করে দেখতে লাগলেন টর্চ জ্বেলে। কিন্তু অমাবস্যার রাত, বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিছু দেখা গেল না। নিচে একতলার লবিতে আলো জ্বলছিল। তারই আলোয় রাধাকান্তবাবুর হঠাৎ মনে হলো বটগাছের কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। পরক্ষণেই রাধাকান্তবাবুর জোরালো টর্চের আলোটা ঝলসে উঠল বটগাছের ওপর। নাঃ কেউ তো কোথাও নেই। মনে মনে হাসলেন রাধাকান্তবাবু—'আমি তাহলে আজকাল ভয় পাচ্ছি!' মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে রাধাকান্তবাবু এবার শুয়ে পড়লেন, কিন্তু হাতের রিভলবারটা দরজার দিকে তাক করে রইলেন।

শুয়ে থাকতে থাকতে রাধাকান্তবাবুর একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। মাথার কাছে রাখা মিউজিক্যাল ঘড়িটা বাজনা বাজিয়ে জানিয়ে দিল

রাত বারোটা। যেটুকু তন্দ্রা এসেছিল—কেটে গেল। নিদ্রাহীন চোখে তিনি তাকিয়ে রইলেন দরজার দিকে। যা ভেবেছিলেন তাই। দরজাটা ভেতর থেকে চাবি দেওয়া, তবু দরজার সামনে তিনি একটি ছায়ামূর্তি দেখলেন যেন। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টিপে ওকে মারবার জন্যে তাক করলেন। আশ্চর্য! একটা গুলিও লাগল না সেই ছায়ামূর্তির গায়ে। মূর্তি ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

মূর্তিটা হঠাৎ ধরবার আগেই কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। নিমেষের মধ্যে ঘরের সব আলো নিভে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠল রাধাকান্তবাবুর হাতের টর্চটা। চমকে উঠলেন রাধাকান্তবাবু! এ কি! এ তিনি কি দেখলেন! না মূর্তি নয়, অথচ একটা অবয়ব। ঠিক মানুষের মতো। মুখ বলে কিছু নেই। ফাঁকা। চোখের মধ্যে দিয়ে লাল আগুনের গোলা দুটো যেন বেরিয়ে আসছে। হাত-পা নেই। যেন বাতাসে একটা আলখাল্লা ঝুলছে। রাধাকান্ত আবার গুলি ছুঁড়লেন। এগুলিও ওকে ভেদ করে চলে গেল। চারদিক থেকে একটা হাসির শব্দ ভেসে উঠল। কে যেন ফিসফিস বলে ওঠে, 'আমি ঘুমতে চাই, আমায় ঘুমতে দে।' সঙ্গে সঙ্গে ফাঁকা মুখের মধ্যে থেকে, সেই জ্বলন্ত আগুনের গোলা দুটো থেকে বেরিয়ে এল তীব্র দুটো নীল আলো। রাধাকান্তবাবুর চোখ দুটো মনে হলো যেন ঝলসে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠতেই তাঁর হাত থেকে রিভলবারটা পড়ে গেল। চারদিক থেকে কেমন একটা পচা গন্ধ নাকে এসে লাগল। অন্ধ রাধাকান্তবাবু হাত দিয়ে হাতড়াতে লাগলেন পড়ে যাওয়া রিভলবারের খোঁজে। পেলেন না। ইতিমধ্যে বন্দুকের শব্দে ছুটে এসেছে দুজন দরোয়ান। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ—বাইরে থেকে চিৎকার করে ডাকতে লাগল ওরা—'বাবু...বাবু...!' কোনো সাড়া নেই। মাঝরাতে ওরা দরজা ভেঙে ফেলল। কিন্তু কি আশ্চর্য! রাধাকান্তবাবুকে কোথাও খুঁজে পেল না ওরা।

ভোরবেলা দেখা গেল রাধাকান্তবাবুর প্রাণহীন দেহটা গাছের ডালে ঝুলছে।

এবার স্থানীয় ছেলেরা এগিয়ে এলো। দল বেঁধে সবাই মিলে দূরে ফেলে দেওয়া কফিনটা পোড়াবে বলে এগিয়ে গেল। কফিন খুলে দেখা গেল—সেই মৃতদেহটা তখনও তেমনই আছে। ওদের ধারণা হলো

এই মৃতদেহটাই রাত্তিরে জ্যান্ত হয়ে মানুষ মারে আর রক্ত চুষে খায়। এই বাড়ির ওপর ওর এজন্যেই রাগ—কারণ তার কফিন এরা ভিত খোঁড়ার সময় বার করেছে। তার চিরশান্তিময় ঘুমের ব্যাঘাত করেছে। তাই সেও ওদের ছাড়বে না। ওদের কারুকে সে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

কফিনের সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহটাও জ্বলতে লাগল দাউ দাউ করে। স্থানীয় লোকেরা বলাবলি করতে লাগল—আর কোনো ঝামেলা হবার সুযোগ রইল না। ঠিক করল—পরদিন চার্চে গিয়ে ফাদারকে দিয়ে বাড়িটা মন্ত্রপূত করিয়ে নেবে—যাতে রাধাকান্তবাবুর আত্মীয়রা এটা ভোগ করতে পারে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! সে রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি আর মুহুর্মুহু বজ্রপাত হতে লাগল। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল বাড়িটার মাথায়।

পরদিন দেখা গেল ভোজবাজির মতো অতবড় বাড়িটা ধুলোয় মিশিয়ে গেছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, সেই কয়েকশ' বছরের গাছটারও আর কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তার বদলে পড়ে আছে স্তূপাকার ছাই।

# চাকরির বিজ্ঞাপন

চাকরির জন্যে যখন হন্যে হয়ে ঘুরছি—ঠিক সেই সময় একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল। সকালবেলা চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছিলাম। খুলতেই—দ্বিতীয় পাতার বাঁদিকে দেখলাম—লেখা হয়েছে—"১৫ দিনের চাকরি করে নগদ দু'হাজার টাকা আয় করে নিন" ১৫ দিনে ২ হাজার! ভাল করে পড়তেই দেখি চাকরিটা সত্যিই অভাবনীয়। কলকাতা থেকে ১৫ মাইল দূরে গঙ্গার ধারে এক পুরনো প্রাসাদ। অতিবৃদ্ধ এক মানুষ—সে প্রাসাদের মালিক। লোকজন থাকলেও বইপড়া বিদ্যে তেমন কারো নেই। তাই এই বিজ্ঞাপন। একটা খুব দুর্লভ বই পড়ে তাঁকে শোনাতে হবে। দিন দশেকের মধ্যে বইটি যদি শেষ হয়ে যায় তাহলেও চুক্তিমতো ঐ দু'হাজার টাকাই পাবে। কিন্তু আবেদনকারী হবে ভদ্রবংশীয়, সুদর্শন এবং যুবক।

ভাবলাম মন্দ কি। বসেই তো আছি। যদি ১৫ দিনে ২ হাজার টাকা রোজগার করতে পারি তো কম কিসে। একেবারে দরখাস্ত লিখে নিয়ে বাসে উঠলাম। পথনির্দেশ দেখে বাস থেকে নেমে আবার সাইকেল রিকশা নিতে হলো। রিকশাওলাই পৌঁছে দিল বাড়িটার সামনে। বাড়ি

বললে ভুল বলা হয়। একটা বিশাল প্রাসাদ। জরাজীর্ণ, কত বছর যে তাতে হাত পড়েনি কে জানে! দরজার কাছে একটা মাঝবয়সী লোক বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। তার কাছে গিয়ে বললাম—বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি—বাড়িতে খবর দাও।

লোকটি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আবার বললাম—খবর দাও।

লোকটি এবার একটু নড়ে বসল—তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আসুন।

চাকরির উৎসাহ আমার এখন আর নেই। সব ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগছে আমার। তবুও গেলুম। কিসের টানে কে জানে! ভেতর ঢুকতেই একটা বুনো গন্ধ নাকে লাগল, ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, লোহার বিমগুলো মরচে ধরেছে। দেওয়ালে ড্যাম্প—জানলার ওপরে খুপরিগুলোয় পায়রার বাসা। খানিকদূর যাবার পর অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে করিডোর। বাদুড়ের গায়ের গন্ধ বলে মনে হলো। সিঁড়ি আরও অন্ধকার। দোতলায় উঠে এলুম, একটু যেন তারই মধ্যে আলো-বাতাস দেখতে পেলুম। বারান্দা পেরিয়ে খানিকটা যাবার পর একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ইশারা করে ভেতরে ঢুকে যেতে বলল। বাইরে জুতো খুলে ভেতরে গেলাম। বিশাল বড় একটা ঘর। তার দুদিকে দুটো বিরাট পালঙ্ক, কিন্তু জরাজীর্ণ। একটায় কোনো বিছানা নেই। শুধু শতচ্ছিন্ন একটা ছোবরার গদি পাতা। অন্যটায় বিছানায় চাদর-বালিশ দেওয়া। কিন্তু শ্রীহীন। তার পাশে একটা পুরনো আমলের ইজিচেয়ার, তাতে বসে আছেন এক অশীতিপর বৃদ্ধ। ছোটখাট চেহারা। মাথার চুলগুলো শণ-নুড়ি। কোটরে বসা চোখ দিয়ে পিটপিট করে আমাকে দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। মুখ দেখে মনে হলো—বোধহয় খুশিই হয়েছেন আমায় দেখে। বললেন—বিজ্ঞাপন দেখে এসেছো?

মাথা নাড়লাম। বৃদ্ধ আবার জিজ্ঞেস করলেন—যে শর্ত রয়েছে তাতে রাজী তো?

বললাম—হ্যাঁ।

বৃদ্ধ বললেন—তবে শোন, একটা কথা কিন্তু লিখতে ভুল হয়ে গেছে। রাত্তিরে আমার ভাল ঘুম হয় না। তুমি একটু রাত্তির করে আমায় বই পড়ে শোনাবে। শুনতে শুনতে আমার ঘুম এলে তুমি বন্ধ করবে পড়া। কি রাজী আছ?

ভাবলাম, নাচতে নেমেছি যখন ঘোমটা টেনে লাভ কি! ১৫ দিনের মতো মামলা—যাহোক করে কটা দিন কাটিয়ে টাকা নিয়ে কেটে পড়তে হবে। মুখে বললাম—রাত্তির হলে আমি ফিরব কি করে?

ভদ্রলোক বললেন—এ বিশাল পুরীতে আমি আর আমার এই চাকরটা থাকে। এখানে কেউ থাকতে পারে না। ভয় পায়। তুমি যদি থাকতে পার তাহলে পাশের ঘরটা খুলে দেবো।

আমি ভাবছিলুম—এই প্রেতপুরীতে থাকব কি করে? তাও একদিন-আধদিন নয়, একেবারে ১৫ দিন।

আমার মুখ দেখে বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন—এখন যাও বিশ্রাম করো—পরে ভেবেচিন্তে উত্তর দিও।

বৃদ্ধের কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল—রীতিমতো পৌরুষত্বে আঘাত লাগল। কিছু না ভেবেই বলে দিলাম—থাকব।

বৃদ্ধ একটু যেন খুশিই হলেন। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। বললেন, বেশ। তাহলে আজ রাত থেকেই তুমি কাজ আরম্ভ কর।

বললাম—আজ না কাল। .বাড়িতে বলা নেই, একবার বাড়ি যেতে হবে। তাছাড়া জামাকাপড় কিছু আনতে হবে।

বৃদ্ধ বললেন—ঠিক আছে, কাল সন্ধ্যেবেলা তুমি চলে এস।

সব কথা মাকে বললুম না। শুধু বললুম—কদিনের জন্যে একটা চাকরির ব্যাপারে একটু বাইরে যাচ্ছি। পরের দিন বিকেলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, হঠাৎ মা ঘরে ঢুকলেন। আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—দেখ খোকা, তুই কোথায় কতদূরে যাচ্ছিস জানি না। তবে মনটা আমার বড্ড কুচিন্তা করছে। তুই তোর গলায় এই রক্ষাকবচটা পড়ে নে, ভগবান তোকে রক্ষা করবেন।

এই বলে মা নিজের গলা থেকে তাবিজ ঝোলানো রুপোর চেনটা খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। বললাম—মা, তোমার গলা থেকে এটা খুললে কেন?

মা বললেন—বিদেশ-বিভূঁইতে তোকে রক্ষা করবেন ঠাকুর। আমার জন্যে চিন্তা করিসনি। আমি তো বাড়িতেই রইলুম। আমার গৃহদেবতা আমাকে দেখবেন।

মায়ের পায়ে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে ভাবলাম—কি করে মা বুঝতে পারল যেখানে যাচ্ছি সেটা খুব নিরাপদ নয়!

সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে গেলাম প্রাসাদে। লোকটিকে বোধহয় বলা

ছিল। সে আমাকে নিয়ে একেবারে দোতলায় আমার জন্যে খুলে দেওয়া ঘরে এলো। দেখলাম ছোট্ট ঘর কিন্তু পরিষ্কার। সেকালের সোফা, সামনে একটা টেবিল—তাতে চায়ের সরঞ্জাম, বিস্কুট সব দেওয়া। লোকটি একটা খবরের কাগজও এনে দিল পড়ার জন্যে।

বাইরের কোনো গীর্জায় বোধহয় রাত আটটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটা ঘরে ঢুকে বলল—বাবু ডাকছেন। বলেই লোকটা চলে যাচ্ছিল। বললাম—শোন, তোমার নামটা কি বল তো?

লোকটি আমার দিকে ফিরে তাকাল, চোখের দৃষ্টিটা কেমন ঘোলাটে। ভাবলাম এসব লোক সাধারণত রাত্তিরে গাঁজা খায়। তাই বোধহয় চোখটা অমন হয়েছে। লোকটি একটু চুপ করে থেকে বলল—মোসাহেব। বলেই নিমেষে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মোসাহেব? এ আবার কোনো নাম হয় নাকি? অবাক হলেও কৌতূহল দমন করলাম। কেননা একথা জিজ্ঞেস করব কাকে বুঝতে পারলুম না।

ঘরে ঢুকে দেখলুম বৃদ্ধ বসে আছেন খাটের পাশে একটা ইজিচেয়ারে। মাথাটা পেছনে হেলানো—চোখ বন্ধ। ভাল করে লক্ষ্য করলুম—চোখ দুটো কোটরাগত, গাল তুবড়ে গেছে—কেমন যেন মড়ার মতো মুখটা। আধো অন্ধকারে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনকে প্রবোধ দিলুম—এ তো হতেই পারে, বয়সটা ভুলে গেলে চলবে না। গলাটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল, মনে হলো একটু জল হলে হতো, এমন সময় মোসাহেব ঘরে ঢুকল। বললাম, একটু জল দেবে? বড় তেষ্টা পেয়েছে। মোসাহেব চট্ করে বেরিয়ে একটা কাঁসার গেলাসে জল নিয়ে এলো। হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতে দেখলুম দুটো বাতাসা। বললুম, এটা কেন?—লোকটা উত্তর দিল না—একটা টুল টেনে নিয়ে দরজার কাছে বসল। বৃদ্ধ বললেন—খেয়ে নাও, তারপর সামনের টেবিলের ওপর রাখা একটা প্যাকেট দেখিয়ে বললেন—ওটা খোল। প্যাকেটটা খুলতেই একটা বেশ মোটা ধরনের বই বেরল। ভাবলাম, রামায়ণ কি মহাভারত। কিন্তু তা তো নয়, ঐ রকমই মোটা, চামড়ায় বাঁধানো বহু পুরনো বই। ওপরে সোনালী অক্ষরে লেখা—'মৃত্যুরহস্য'।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এ কি! এইটা আপনি শোনবার জন্যে, এত...

বৃদ্ধ বললেন—তোমার বুঝি মনে হচ্ছে এটা মামুলি বই! শোন আমার বাড়ির নিচে একটা চোরাকুঠুরি আছে। কদিন আগে নিচ থেকে

একটা শব্দ ভেসে আসছিল। কে যেন হাতুড়ি দিয়ে কি ভাঙছে। মোসাহেবকে পাঠালুম দেখতে। ও দেখতে দেখতে চোরাকুঠুরিতেও ঢুকে গেছল। তখনই ও দেখল কোণের দিকে একটা ভাঙাচোরা তাকে এটা পড়ে আছে। তুলে এনে আমাকে দিল। কিন্তু চোখের দৃষ্টি তো নেই, পড়ব কি করে! তাই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম। আশা করি ১৫ দিনের মধ্যে বইটা তোমার পড়া শেষ হয়ে যাবে। আসলে কি জানো? বইটা কি করে ওখানে এলো! কে রেখেছিল, কেনই বা রেখেছিল—এইসব কৌতূহলের জন্যে মনে হলো বইটা পড়া দরকার। বৃদ্ধ হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, পড় পড়। আমি যতক্ষণ না বলি ততক্ষণ পড়বে। বন্ধ করতে বললে বন্ধ করে চলে যাবে—আমার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবে না। তাতে আমার ঘুমের রেশ কেটে যাবে, নাও পড়ো।

দেরি করে আরম্ভ করেছিলাম, কয়েকটা পাতা মাত্র পড়া হয়েছে, দূর থেকে রাত ১২টা বাজার ঘণ্টা ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ বলে উঠলেন—থাক আর না।

টুলে বসে ঢুলছিল মোসাহেব—মালিকের গলা শুনে চট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল আমার দিকে। বলল—আসুন। বইটা রেখে বেরিয়ে আসতেই দেখলুম বৃদ্ধর ঘরের আলোটা নিভে গেল।

ঘরটা আমার খারাপ নয় ভালই। কিন্তু নতুন জায়গা, কিছুতেই ঘুম আসছিল না। চিরকাল আমার ডায়রি লেখার অভ্যাস—বেশ অনেক রাত পর্যন্ত প্রাসাদের কথা লিখলুম।

বেশ কটা দিন কেটে গেছে। প্রাসাদটা আমার কাছে আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। খাবার-দাবার ঠিক সময়ে টেবিলের ওপর সাজানো থাকে। কিন্তু দিনের বেলায় কাউকে দেখা যায় না। কে কখন খাবার রেখে যায় ধরতে পারি না। দিনের বেলা বৃদ্ধ বা মোসাহেব বা অন্য কাউকেই দেখতে পাই না। চেষ্টা যে করিনি তা নয়। বেশ কয়েকবার বৃদ্ধের ঘরের সামনে গিয়ে উঁকিঝুঁকিও মেরেছি। কিন্তু সবসময় দরজা বন্ধ থাকে। আবার বইটাও অর্ধেকের ওপর পড়া হয়ে গেছে। এমন অদ্ভুত বই আমি কখনও পড়িনি। শুয়ে শুয়ে ঘুম আসছিল না। ভাবছিলুম গল্পটার কথা।

'গভীর রাতে এক যুবক ছোরা হাতে চলেছে কাকে যেন খুন করবে বলে। খানিকটা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যুবকটি ঘুমন্ত অবস্থায়

চলছে। ঘুমের ঘোরে চলেফিরে বেড়ানোটাই ওর রোগ। দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলছে—কেউ টের পায় না। বেশ কয়েকটা খুনও হয়ে গেল সে বাড়িতে। কিন্তু কে করছে, কেন করছে, ধরা পড়ল না। বাড়িতে যত লোকজন ছিল—সব শেষ হয়ে গেল। শুধু বাকি রইল ঐ যুবক আর তার এক প্রিয় চাকর বিশু।'

গল্পটা পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে। এখন প্রায় শেষের দিকে। হয়তো আজ রাতেই শেষ হবে গল্পটা। তাছাড়া দিনও তো শেষ হয়ে এলো। শর্তমতো কালই বলতে গেলে চুক্তির শেষ দিন।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন রাত্তিরে ঠিক আটটার সময় ডাক পড়ল। আজ ঘরে ঢুকে দেখি বৃদ্ধ ঘরের আলোটা খুব কমিয়ে রেখেছেন। কি করে বই পড়ব ভাবছি। বৃদ্ধ বললেন, আমার শরীরটা আজ ভাল নেই—তুমি ঘরের আলো না জ্বেলে টেবিলে মোমবাতি আছে, জ্বেলে পড়। তাই করলাম। মোমবাতির শিখা কাঁপছে। তবু তারই মধ্যে ঐ কম আলোতেই পড়তে লাগলুম—

'যুবকটি আজ আবার ছোরা হাতে এগিয়ে আসছে একটা বন্ধ ঘরের দিকে। ঘরের দরজাটা ঠেলতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে বিশ্রী শব্দে দরজাটা খুলে গেল।' চমকে উঠলুম। দরজার কাছে প্রতিদিন মোসাহেব বসে থাকে, আজ নেই। ঘরে দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। বৃদ্ধের দিকে তাকালুম, মড়ার মতো শুয়ে আছে খাটে। কথা বলার হুকুম নেই। থামতে না বলা পর্যন্ত পড়তেই হবে। পড়তে শুরু করলাম তাই।

'ছেলেটি ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছে। টেবিলে একটা হ্যারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে। ছেলেটি সেই প্রায় অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে অথচ অন্ধকারে তাকে ভালো দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে তার উঁচিয়ে থাকা ছোরাটা এক একবার চকচক করে উঠছে। যুবকটি ছোরা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে বিছানায় শুয়ে থাকা একটা মানুষের দিকে। নিমেষে সে ছোরাটা বসিয়ে দিল খাটে শোওয়া মানুষের বুকে...হঠাৎ খিল খিল হাসি...যুবকটি দেখল খাটের ওপর শুয়ে আছে একটা কঙ্কাল। ততক্ষণে ওর ঘুম কেটে গেছে—চিৎকার করে ওঠার আগেই কেউ যেন তার মুখ চেপে ধরল। হা হা করে হেসে উঠল কঙ্কালটা। তারপর যুবকের গলাটা দু'হাতে ধরে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে।' ধপ্ করে একটা

শব্দ হলো। চমকে ফিরে তাকালুম আমি। এ কি! এ আমি কি দেখছি! খাটের ওপর বৃদ্ধ নয়—বসে আছে এক কঙ্কাল। হা হা করে হাসির শব্দ কান ফাটিয়ে দিতে লাগল। দরজার কাছে ওটা কে! মোসাহেব! চিনতে পারা যাচ্ছে না। একটু একটু করে চেহারা বদল হচ্ছে তার। মাঝবয়স থেকে বৃদ্ধ...অতিবৃদ্ধ হয়ে যেন ধুলো হয়ে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। এবার কঙ্কালটা উঠে দাঁড়াল—চকচক করে উঠল তার হাতের ছোরা। এক পা এক পা করে যেন এগিয়ে আসছে ছোরা হাতে—আমার বুকে বসিয়ে দেবে বলে। মুহূর্তের মধ্যে বুঝলুম—এই আসলে গল্পের নায়ক। রক্ত ছাড়া যে বাঁচতে পারে না। গল্প বলার মিথ্যা জালে আমাকে জড়িয়েছিল মারবে বলে।

নিমেষের মধ্যে মোমবাতিটা উল্টে ফেলে দরজার দিকে ছুটে গেলাম। প্রাণভয়ে ছুটছি তো ছুটছি—দালান পেরিয়ে সদর—সদর পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়।

পরদিন পুলিশ নিয়ে হাজির হলাম। কোথায় কে! সমস্ত বাড়িটাই নিস্তব্ধ। একটা লোক নেই। সাতপুরু হয়ে ময়লা পড়ে আছে চারদিকে।

বৃদ্ধের ঘরটিও ফাঁকা—গেল কোথায় সব? পুলিশের দিকে তাকালাম। ওদের চোখে সন্দেহ, দেখলাম টেবিলের ওপর সেই বইটা পড়ে আছে। সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে এটাই তুলে এনে পুলিশের হাতে দিলুম। বইটা উল্টেপাল্টে দেখে পুলিশ সেটা আমার সামনে খুলে ধরল—দেখলাম কোথাও কিছু নেই। একটা পাতাতেও লেখার আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি। শুধু সাদা পাতা। পুলিশ আবার তাকাল আমার চোখের দিকে। বললাম, বিশ্বাস করুন। আমি মিথ্যে বলি না।

ভাবলাম, আবার বিজ্ঞাপনটা দেখাব। তাহলে তো আর সন্দেহ হবে না! ওদের সঙ্গেই গেলাম। বাড়ি ফিরে দৌড়ে গেলাম শোবার ঘরে কাগজের বিজ্ঞাপনটা বার করব বলে, তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। ফাইলের পর ফাইল খোঁজা হলো—কিন্তু সেটাও পাওয়া গেল না। বুদ্ধি করে আসল খবরের কাগজটা বার করলুম—আশ্চর্য! সেখানে বিজ্ঞাপনের কোনো চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

আপনা হতেই গলায় হাতটা চলে গেল। রক্ষাকবচটা আছে তো! আছে। এর জন্যেই হয়তো আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। মাকে একটা প্রণাম করলাম।

---